নারী ও সমাত ব্যবস্থার একতি দিক

শ্রীমতী সঙ্গীতা ত্রিপাঠী মিত্র,

অধ্যক্ষা, বেথুন কলেত, বিধান সরণী, কলকাতা

sangeetatripathi003@yahoo.in

ইতিহাস মানুষের তীবনের নানা পর্যায়ের কথা বলে। তার মধ্যে শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের বিভিন্ন দিক দেশের অভ্যন্তরের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরে। সর্বদা শাসিত বর্গের সরব সক্রিয় উপস্থিতিই আমাদের সামনে আসে। কিন্তু এই বর্গের একতা নীরব শ্রেণী আছে। যাদের সম্পর্কে আমরা তততা সচেতন নই। অথচ এরা দেশের ও সমাত্তের একতি অনালোকিত দিকের ইতিহাস রচে চলেছে নিরন্তর।

মানুষ যাতে সুস্থ সুণ্ঠর সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত তীবন যাপন করতে পারে, তাই সমাত ও তার নিয়মের সৃষ্টি। কিন্তু মানুষের আচরণ অনেক সময় উচিত অনুচিতের নিয়ন্ত্রণে না থাকতে পেরে প্রবৃত্তির তানে প্রবাহিত হয়। এই প্রবাহ তন্ম দেয় অপরাধের। আর এই অপরাধ দমনের তন্যই কারার লৌহকপাত ও তার দন্ডবিধির প্রবর্তন। প্রত্যাশা এই যে - তাতে নিয়ম শৃঙ্খলা বত্তায় রেখে সমাত-তীবন সুষ্ঠু রূপে অতিবাহিত হবে।

পরবর্তী কালে এই বণ্ডীগৃহ ও তার শৃঙ্খলাকে অপরাধীর সংশোধনাগার হিসেবে ভেবেছেন মানবতাবাদীরা। যাতে সংশোধনের পরে সমাতে ফিরে গিয়ে আবার সুস্থ সুণ্ঠর তীবনের অধিকারী হতে পারে দোষী মানুষতি। কিন্তু বাস্তব কি তার সাক্ষ দেয়?

সমাত্তের অবহেলিত, দরিদ্র সাধারণ মানুষ তাদের সুখ দুঃখ ব্যাথা বেদনা নিয়ে সাহিত্যের পাতায় উঠে এসেছে বিভিন্ন সংবেদনশীল সাহিত্যিকের কলমে। এদের তীবনকথা পাঠকমনকে ভারাক্রান্ত করেছে, ভাবিয়েছে। কিন্তু কারাবণ্ডী মানুষের অসহায়তার ইতিহাস প্রথম পাওয়া গেল ১৯৫৩ সালে সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় ত্রাসন্ধের (চারুচন্দ্র বণ্ডোপাধ্যায়) ধারাবাহিক রচনা 'লৌহকপাত' প্রকাশের মাধ্যমে। কখনো কখনো কোনো কোনো গল্প বা উপন্যাসে কাহিনির প্রয়োতনে হয়তো কারাগারবাসী মানুষের প্রসঙ্গ পাওয়া যাবে। কিন্তু ঐতুকুই। সমাত্তের চোখে অপরাধী মানুষগুলি কারাতীবন বা তাদের ব্যক্তিগত তীবন সম্পর্কে কোনো কৌতুহল বা মনোযোগ দেখা যায়নি এর পূর্বে। এদের প্রতি তথাকথিত 'নিরপরাধ' মানুষতনের ভ্রূকুতি ও ঘৃণা প্রদর্শন এবং দূরত্ব বত্তায় রেখে চলার ইচ্ছাই প্রকত হয়েছে সব সময়।

ত্রাসন্ধের রচনা থেকে এই প্রথম তনা গেল অপরাধী মানুষেরা বিভিন্ন স্থান থেকে আসে। শাস্তি পেয়ে তীবন কাতায়। হয় তো চরম দন্ডের অপেক্ষা করে। মেয়াদ ফুরলে কেউ ফিরে যায় অথবা বিনা অপরাধে ঘতনার বিপাকে আবার পুরনো বন্ধুদের মধ্যে ফিরে আসে কেউ কেউ। কখনো দেখা যায় তেলের খাতায় যে বিরাত দাগী আসামী প্রকৃতপক্ষে অন্তরে সে সাধু ধার্মিক ব্যক্তি। এরা আসলে শুধুমাত্র পরিস্থিতির শিকার। শাসকশ্রেণীর ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রবণতা, কর্মে নিষ্ঠা, সততা ও স্বচ্ছতার অভাব এদের অসহায়তাকেই দক্ষ লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করে পাঠকের দরবারে উপস্থিত করেছেন ত্রাসন্ধ। যার ফলে এই চিরন্তন সত্য উপলব্ধ হয় যে কারাবাসী মানুষগুলির 'অপরাধী' বা কয়েদী নয় একমাত্র মানুষের পরিচয়তাই প্রকৃত।

কারাগারে মহিলা বণ্ডীদেরও একতা তীবন আছে। যে তীবন কারার প্রশাসন, বিধি ব্যবস্থা ও সমাত্তের চিত্র স্পষ্ট করে তোলে। পরিপূর্ণ করে তোলে মানব সভ্যতা ও দেশের ইতিহাস। বণ্ডীশালার নেপথ্যে যে করুণ কাহিনি বিভিন্ন গ্রন্থে স্থান পেয়েছে সেই ঘতনাগুলিকে এবং নারীতীবনের অন্য এক পরিচয় পাবার তন্য আত আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি সময়ের তিনতি আধারকে বেছে নেওয়া হয়েছে। শ্রীমতী রাণী চণ্ডের 'তোনা ফাতক', শ্রীমতী সুরমা ঘতকের 'শিলং তেলের ডায়েরি' এবং শ্রীমতী মীনাক্ষী সেনের 'হাততি নম্বর মেয়াদী নম্বর'। গ্রন্থগুলি নারীর তীবন যন্ত্রণার দলিল স্বরূপ।

স্বাধীনতার পূর্বে আগস্ত বিপ্লবের সময় রাতনৈতিক বণ্ডী ছিলেন শ্রীমতী চণ্ড। সেই সময়ের কারার ওপারের সাধারণ নারীর তীবনচিত্র অঙ্কিত তোনা ফাতকে। পঞ্চাশের দশকে, ভারত তখন স্বাধীন সুরমাদেবী কম্যুনিস্ত আণ্ডোলনের কারণে শিলঙের তেলে আতক ছিলেন। সরল খাসিয়া মেয়েদের তেলবণ্ডী তীবনের হাহাকার আন্তরিকতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন তিনি তাঁর গ্রন্থে। সত্তরের নকশাল আণ্ডোলনের ফলে তেলে বাধ্যতামূলক আশ্রয় নিতে হয় শ্রীমতী সেনকে। তাঁর শোনা নিরূপায় নারীর হতাশা ভরা আর্তনাদ সরাসরি ঘতনাবলীর মাধ্যমে রূপ পেয়েছে 'তেলের ভিতর তেল'-এর দুইতি পর্ব 'পাগলবাড়ী' এবং 'হাততি নম্বর মেয়াদী নম্বরে'।

সিউড়ী, হিত্তলী, মেদনীপুর, কালিঘাত, সেন্ত্রাল, রাত্তশাহী প্রভৃতি নানা ফাতকের সাধারণ অপরাধিনীদের সঙ্গে কেতেছিল শ্রীমতী চণ্ডের কারা তীবন। শ্রীমতী রাণী চণ্ড — যাঁর তীবনের অনেকতা সময় অতিবাহিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আশ্রমের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিবেশে। রবীন্দ্র নৃত্য ও নাত্যের প্রদর্শনে দেশে বিদেশে খ্যাতি লাভ করেছিলেন তিনি। সাহিত্যকৃতি তাঁকে রবীন্দ্রপুরস্কারে ভূষিত করেছিল। বিবাহ সূত্রে আবঃ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সচিব শ্রী অনিল চণ্ডের সঙ্গে। পরাধীন ভারতে বৃতিশ প্রশাসনের বিরুঃাচরণের তেরেই তাঁর কারাবাস।।

বিভিন্ন জেলে অবস্থানকালে তিনি অবাক হয়ে দেখেছিলেন সরল নিষ্পাপ মুখের অল্প বয়সী মেয়েদের। যারা দৃঢ়তার সঙ্গে স্বামী হত্যা করে নিশ্চিন্তে কুড়ি বছরের বন্দী জীবন মাথা পেতে নিয়েছে। পরে কেউ অনুতপ্ত আবার কারোর কোনো অনুশোচনাই নেই। এখন প্রশ্ন হল অবলীলা ক্রমে প্রিয়জনকে হত্যার কারণ কি? কেন কোনো অপরাধবোধ কুরে কুরে খায় না এদের? হাত কাঁপে না একতুও এই নির্মম কর্ম সাধনের সময়!

রাণী চন্দের রচনা থেকে এতাও স্পষ্ট যে স্বামীর অত্যাচার ছাড়াও এই প্রিয়জন হত্যার আর এক কারণ অবৈধ প্রণয়। নারী ও পুরুষ উভয় পক্ষেই এই আচরণ সংঘতিত হতে পারে। স্বামীকে বশ করতে না পারাই হোক বা অন্য পুরুষের প্রতি আকর্ষণই হোক অথবা স্বামীর অতিরিক্ত ভালোবাসার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবার কাঙ্ক্ষাতেই হোক জমিনা, মলিনা, নেছামন, মিছিরন, তামিসন নিজেদের স্বামিকে হত্যা করেছে। আজিমন করেছে গৃহত্যাগ। আজ তারা জেলবন্দী। কিন্তু তার জন্য তাদের মনে কোনো অনুতাপের লেশমাত্র নেই।

আরো দেখা যায় স্বামী হত্যার নতুন ইতিহাস রচনা করেছে সুরাজন। নির্দোষ স্বামী অকারণেই তার সহ্যের অতীত ছিল। অনুগত স্বামীকে বিষ খাইয়ে হত্যা করে কোনো অনুশোচনা তো তার হয়ই নি বরং কারামুক্ত হয়ে আবার স্বামীর সংসারে যেতে হবে না ভেবেই সে সুখী। কি কারণে মানসিক বিকৃতির শিকার সে? কেন স্বামীর ভালোবাসা সে অবহেলা করেছে? স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী সে তার স্বামীকে পেয়েছে বলে? কারণ যাই হোক অন্য পুরুষে সে আসক্ত। এর পরিণাম কখনো শান্তি ডেকে আনে নি।

এদিকে সমিরন আমাদের অন্য অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করে। সে তার 'শয়তান' স্বামীর অন্যায় মুখ বুজে সহ্য করে নি। বরং সংসারে দায়িত্ব পালনে অক্ষম পুরুষতিকে দায়ের এক কোপে শেষ করে উচিত কাজই করেছে মনে করে সে। কারণ উক্ত অযোগ্য পুরুষতি তার বাপ মা তুলে কথা বলত। এর থেকে এতাই প্রমাণিত হয় আর্থিক দুরবস্থাই তাদের মনোমালিন্যের কারণ। তার উপরে সংস্কার ক্রমে পুরুষের অতিরিক্ত অধিকার প্রদর্শন তো আছেই। কিন্তু এর জন্য সমিরন তো দায়ী নয়? সেই বা তার প্রতি এ অপমান মেনে নেবে কেন? অসহায় অপমানাহত রমণীর প্রতিবাদ তাই নির্মম রূপ নিয়েছে। তার জীবনের পরিণতি হয়েছে নিমর্মতম। এমন অজস্র ঘতনা জুড়ে জুড়ে তৈরী সাধারণ মানুষের জীবন যা সাধারণ ভাবে দেশের ইতিহাসের পাতায় থাকে অধরা।

দাম্পত্য জীবন যেখানে নারী পুরুষ উভয়ের সমান আন্তরিকতায় ভালোবাসা পরিপূর্ণ রূপে গড়ে ওঠার কথা সেখানে আর্থিক অস্বচ্ছলতা জনিত সংকত, পুরুষের মিথ্যা উপায় অনুসন্ধান, তাকে গর্হিত অপরাধের দিকে চালিত করেছে। আইন ও সমাজ দণ্ড দিয়ে দায়িত্ব মুক্ত। কিন্তু অপরাধের উৎস অনুসন্ধান ও তার নির্মূলীকরণ প্রয়োজন নয় কি?

উল্লিখিত ঘতনাগুলি এই সত্যই উপস্থিত করে যে বিশেষ ভাবে মুসলমান সমাজে পুরুষের যে প্রবল আধিপত্য ও স্বেচ্ছাচার তাই নারীমনের বিকৃতির উৎস। এই নাগ পাশ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই কিশোরী আর যুবতীদের কুড়ি বছরের বন্দী জীবন দান করেছে। জীবনের সুন্দর মুহূর্তগুলি জেলের চার দেওয়ালের মধ্যে যে অত্যাচার ও বেদনার মধ্যে কাতে তার চেয়েও অসহ্য ওদের কাছে স্বামীর সংসার। ফলে কোলের সন্তান সহ বন্দী জীবন অতিবাহিত করে বাইরের আলো হাওয়া গাছ পালা পশু পাখি প্রভৃতি স্বাভাবিকতার সঙ্গে পরিচয় রহিত হয়ে। তার পরে তারা পরিবার বর্গের কাছে যায় মাকে ছেড়ে। বাড়ি না থাকলে সরকারের দায়িত্বে হোমে যায়। সেখানে মানুষ হয়ে ওঠার আদর্শ পরিবেশ থাকে না বলে মায়েদের দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না। কিন্তু অনোন্যপায় তারা। বাড়িতে ফিরে গেলেও অপরাধিনীর সন্তান যে আদর আপ্যায়নে আপ্লুত হবার সুযোগ পায় এমন কল্পনা না করাই ভাল। আর্থিক দুরবস্থা ও পুরুষের প্রাধান্য এবং অত্যাচারের অসুস্থ ও অস্বাস্থ্যকর ফল ভোগ করে গোতা পরিবার। এমন ঘতনা ঘতে চলেছে গ্রামে গঞ্জে সাধারণ পরিবারে বারে বারে।

তবে অপরাধিনীদের অপরাধের কারণ হিসেবে সমাজ শুধু এতুকুই ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত থাকে নি। পুরুষের একাধিক বিবাহ নারী যন্ত্রণার অন্যতম এবং গুরুত্বপূর্ণ কারণ। সতীন বা তার সন্তানকে সহ্য করা যে কোনো নারীর পক্ষেই হৃদয় বিদারক। তার উপর এরা যদি স্বামীর অধিক প্রিয় হয় তা হলে যে আগুনে হৃদয় পোড়ে তা নির্বাপন অসাধ্যই বলা যায়। তাই এগারো বছরের সতীনপুত্রের মাথা থেঁতলে উনুনের আগুনে ঢুকিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে স্বামীকে ভাত দিতে ক্ষেতে যেতে পারে সৎমা এমন ঘতনাও ঘতে। সংসারে। নিজের অধিকারের স্থানতি থেকে বিচ্যুত হবার আশঙ্কা থেকেই এমন হৃদয়হীন মানসকিতার সৃষ্টি। আর এমন ঘতনার সংখ্যা একে বারে বিরলও নয়।

উল্লিখিত নারীরা তো অপমান বা অবহেলা কিম্বা ঈর্ষার কারণে মানসিক বিকারগ্রস্থ হয়ে অপরাধ করে জেলে এসেছে। কিন্তু আদৌ কোনো অপরাধ না করেই এদের কঠিন শাস্তি হয়েছে এমন নজিরও সংসার এবং কারাকর্তৃপক্ষ রেখেছেন। তাই অপরাধী স্বামী পলাতক হলে স্ত্রীকে তার দন্ড ভোগ করতে হয়। সন্তানতুল্য প্রাণাধিক প্রিয় পোষ্যপুত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে কারার শৃঙ্খলে আবদ্ধ রূপজানবিবি। প্রকৃত অপরাধী কিন্তু অজানা। আবার শান্ত ধীর স্থির সুন্দর রাধা পিতৃতুল্য দাদাকে হত্যার মিথ্যা দায়ে জেলে। গ্রামের মোতামুতি স্বচ্ছল পরিবারের মেয়ে সে। তার দৃঢ় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন উপস্থিতি মনে সম্ভ্রম জাগায়। সন্ধ্যা আহ্নিক করা সুরুচি সম্পন্ন স্বল্পভাষী রাধা এমন গর্হিত কাজ করতে পারে তা বিশ্বাস করা কঠিন। গ্রামের লোকের মিথ্যা অভিযোগে হতবুদ্ধি শোকার্ত মেয়েতি একতা প্রতিবাদ পর্যন্ত করেনি। সমাজে নারীর জীবনের স্বতন্ত্র কোনো মূল্যই নেই। তাই প্রকৃত অপরাধী না খুঁজে রাধাকে দোষী সাব্যস্ত করতে কারো হৃদয় ব্যথিত হলনা। জেল থেকে মুক্ত হয়ে একবার ভাইদের দেখতে যাবে, কিন্তু সেখানে থাকবেনা কিছুতেই—এ ব্যাপারে দৃঢ় সঙ্কল্প সে। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের শাস্তি গল্পের অভিমানী

চওরার কথা মনে পড়বে। নারী বলেই মিথ্যা হত্যার দায় তাকেও তো নিতে হয়েছিল। (কারণ একতা বউ গেলে আরেকতা বউ পাওয়া যায় অনায়াসে)। চওরাও সরাসরি প্রতিবাদ করে নি। কিন্তু স্বামীর প্রতি তার অভিমান শেষক্ষণ পর্যন্ত অতুত ছিল। ভাইদের প্রতি বাধা অভিমান সেই ব্যক্তিত্বময়ীর স্মৃতি বয়ে আনে না কি? এই অমূল্য তীবন গুলির এমন অপচয়ে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে ওঠে।

বিধবা কাদম্বিনীর তরত সন্তান তন্মেই হাসপাতালে মারা গেল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোনো দোষ হয়না। বরং সন্তান হত্যার দায়ে তার বিশ বছরের সাত্র হয়। অথচ সে সময় তার চেতনাই ছিল না। আবার অর্থের প্রতাপে দিনে দুপুরে দুই সন্তানকে হত্যা করে মলিনা বেকসুর খালাস। এমন নানা ধরনের অবিচার, নিয়ম ভাঙ্গা-ই নিয়মিত হয়ে চলেছে সমাতে। তাই সাধারণ মানুষ আস্থা হারায় বিচার ব্যবস্থার প্রতি।

আরেক ধরনের অপরাধীর পরিচয় দেয় কারার লৌহকপাতের অঔর মহল। অনেক অনাহার-ক্লিষ্ট মানুষ তেলের অন্নে নিশ্চিন্ত তীবন কামনা করে। এই মানসিকতাতেই পরের ক্ষেতে ধান কাতার অপরাধে মুন্ডা মেয়ে কোলের শিশুও মায়ের সঙ্গে তেলে। লঘু পাপে গুরু দন্ড তাদের বিচলিত করে না। কারণ তেলের বাইরের তীবনে অনাহারে অপুষ্টি তনিত দুর্বলতায় শিশুতির কাঁদতেও অক্ষম। বাচ্চাতির তন্য বরাদ্দ দুধ বার্লি তার মা দিদিমার ভোগে লাগে। কারণ মায়ের বুকের দুধ শুকিয়ে যাওয়ায় শিশুতি সেই অমৃত স্বাদে বঞ্চিত। তাই পেলে ভাতই পছঔ তার। এই ধরনের ঘতনায় দেশের অর্থনৈতিক চেহারাতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয় তেলের মেথর না থাকলেও সে কাত সুসম্পন্ন করার উপায় ভাবা আছে তেল কর্তৃপক্ষের। মাংস ভাত খাবার লোভে ওই কাতের তন্য লোক ঠিক তুতে যায়। কারণ সাধারণ ভাবে তেলের খাদ্য বলতে হলুদ তলরূপী ডাল, গলা ভাত আর ঘ্যাঁত। ক্ষুধা আপনিই মিতে যায়। কিন্তু খাতুনির বেলায় পরিশ্রম দেখে অসুরও লজ্জা পাবে। অথচ দিনের পর দিন অর্ধভুক্ত বা অভুক্ত থাকলেও কয়লা মাপার যন্ত্রে বঔীদের ওতন বেড়েই যাওয়া নিয়ম। ফলে 'মাংসের' সুযোগ কাতেলাগানোই বুঞিমানের কাত উভয় পক্ষের কাছেই। সুচিকিৎসক এবং চিকিৎসার অভাবও তেলের বঔীতীবন আরো দুর্বিসহ করে তোলে।

এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নানা স্থান থেকে আসা দুঃখিনীরা তেলের মধ্যে একতা পরিবার। ব্যক্তিগত তীবন ও তেল তীবনের দুর্ব্যবহার তাদের সহ্য শক্তি হ্রাস করে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে কলহে লিপ্ত হয় তারা। আবার মনের যন্ত্রণা, আনঔ পরস্পরে আদান প্রদান করে একে অপরের কাছাকাছি এসে সুখী ও তৃপ্তও হয়। যা সংসার তীবনে তাদের কাছে কল্পনাতীত ছিল।

তেলের একঘেয়ে বিড়ম্বিত তীবনে বৈচিত্র্য আনতে 'বেহুলা লখীঔর পালা' অভিনিত হয়েছে হাস্য কৌতুকের মাধ্যমে। লম্বা হাতাওয়ালা কুর্তাকে পায়ে পরে পুরুষ সেতে, গায়ে কুর্তা, মাথায় গামছার পাগড়ী, বগলে তমাদারনীর লাঠি সহযোগে এই আনঔৎসব পালিত হয়। 'মিতিনে'র বারণ বা অন্য কোনো বিঘ্নকে পরোয়াই করেনা তারা। বঃ মন গুলি আলোর রোশনাইয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। প্রাণরসে পরিপূর্ণ এই আনঔৎচ্ছল সভায় কোনো অপরাধী মন উঁকি মারে কি?

শ্রীমতী চঔ সহ রাতনৈতিক বঔীরা তেলের ভিতর স্বাধীনতা দিবস পালন করেছেন (কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে তওহরলার নেহরু ১৯৩০ সালের ২৬শে তনুয়ারী পতাকা উত্তোলন করে স্বরাতের অধিকার ঘোষনা করেন। ১৯৪৭ এর পূর্ব পর্যন্ত উক্ত দিনতিই স্বাধীনতা দিবস রূপে পালিত হোত) । পরাধীন ভারত। ইংরেতসরকারের অতন্তে দেশকে শ্রঃা তনাতে হবে। চুপি চুপি কারো বিছানার চাদরের কোন কেতে, কারো গামছা হলুদ তলে ছুপিয়ে, কারোর শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে—সাদা হলুদ সবুততিন রঙের তিন তুকরো খদ্দর তুড়ে অতি সন্তর্পনে পতাকা তৈরী করে লুকিয়ে রাখা হয় কয় দিন আগে থেকেই। কারা তীবনে সমস্ত প্রয়োতনীয় তিনিসই তুলনায় অল্প মেলে। তারই মাঝে দেশকে সম্মান তনানোর আকুতি, স্বতঃস্ফূর্ততা, আন্তরিকতা বঔীদের প্রতি শ্রঃা ও তাদের তন্য গর্ব বোধ তগায়। প্রতিকূল পরিবেশে পতাকা উত্তোলনের বর্ণনা রাণী চঔের ভাষায় এই রকম—" ২৬শে সকালে দরতর তালা খোলা মাত্রই খাতের সঙ্গে বাঁধা মশারীর বাঁশে পতাকা লাগিয়ে উঁচু গাছের ডালে লাগিয়ে পতাকা উত্তোলন সারা হয়।" (তেফাঃ, পৃঃ ৭৩)। বঔিনীদের কণ্ঠের—

তয় হোক তয় হোক নব অরুণোদয় তয় তয় হে—

ধ্বনিতে সারা তেল মুখরিত হয়ে উঠেছিল সে দিন। মেতুনও তাঁর পদ মর্যাদা, কর্তব্য এবং নিতের পরাধীনতা ভুলে যথার্থ স্বদেশবাসীর ভূমিকা পালন করে এই বঔিনীদেরই একতন হয়ে পড়েন। পরে অবশ্য তেলারের ধমক খেয়ে তাঁর কর্তব্য জ্ঞান সতাগ হয়ে ওঠে। তখন নিতের আশু বিপদ সম্পর্কে সচেতন এবং চিন্তিত হয়ে বলেন—"*আচ্ছা এক বিপদে ফেলেছেন আমারে। কন দেখি আপিসে আমি এর তবাবা দিমু কি অখন?* (তেফাঃ, পৃঃ ৭৩)। এ উক্তিতি অনুযোগের সুরের সঙ্গে সঙ্গেই বঔিনীদের প্রতি সম্ভ্রমের সুরও যে বহন করছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

হাতর বিড়ম্বনার মধ্যেও তেলে এসে বঔিনীরা বেঁচে থাকার একতা মানে খুঁতেপায়। আন্তরিকতা আর ভালোবাসার স্পর্শে সতীব হয়ে ওঠে তাদের মন। শিবরাত্রির উপোস করায় রাধা আর কদমমনি (কাদম্বিনী)র খাদ্য তালিকাও স্বতন্ত্র। সারাদিন অভুক্ত থাকার পর একতি শাঁখালু দুতি কলা আর এক তুকরো সুতির মন্ড এক এক তনের বরাদ্দ। দুই উপোসীর খাদ্য সবার মধ্যে ভাগ করা হয়। কারণ বঔী তীবনে এ 'সুখাদ্য' সহতে মেলেনা। তাই সবাই ভাগ করে খাওয়াতেই এই নারীদুতির আনঔ। এর ফলে সারা রাত হয় তো তারা একতুকরো ফল খেয়েই কাতাবে। কিন্তু এই একতি রাতের উপোসের কষ্ট, এই স্বার্থহীন সুখ ও আনঔের কাছে ম্লান হয়ে যায়। সংসারের মমতা সহানুভূতি বঞ্চিত হৃদয় গুলি কারাগারে এসে ভালোবাসার একই সুতোয় বাঁধা পড়ে। এদের হাতেই নিষ্ঠুর হত্যা গুলি হয়েছে বিশ্বাস হয়?

এক জেল থেকে অন্য জেলে বদলী হলে কিছুক্ষণের জন্য হলেও বাইরের আলো বাতাসের স্পর্শের কল্পনা মনকে তৃপ্ত করলেও এতদিনের ভালোবাসার নীড় ভেঙে যাবার যন্ত্রণা উভয় পক্ষকেই আক্রান্ত করে। ঘরের লোক দূর দেশে গেলে যেমন চারিদিকে ব্যাস্ততা শুরু হয়, এখানেও তেমনি। সংসার জীবনের অপূর্ণ সাধ এই নারীদের এমনি ভাবেই অল্প অল্প করে সম্পন্ন হয়। বিদায়ী বা মুক্তি প্রাপ্ত মানুষটির জিনিষপত্র যথাযোগ্য প্রস্তুত করে গুছিয়ে দেবার দায়িত্ব, তাকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করে তোলার ব্যবস্থা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে করে অন্যরা। সবার আন্তরিকতা আর মমত্বের স্পর্শে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তবু এই বদলীতিই এদের বৈচিত্র্যহীন বদ্ধ জীবনের আলো।

এই মানুষ গুলি দাগী আসামী হতে পারে? মানুষের শুভ বৃত্তির কোন গুলির অভাব আছে এদের আচরণে? বরং এরাই তো বঞ্চিত তাদের প্রাপ্য অধিকার আর ভালোবাসা থেকে। বিবাহিত জীবনে সুখ না পাওয়া, স্বীকৃতির অভাব কিম্বা অন্য কোনো মনোগত কারণে সমাজে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেখা গেছে। বিশেষত মুষলমান সমাজে। অর্থনৈতিক দুরবস্থা সংসারে অশান্তি ডেকে এনেছে। স্বামীর স্বেচ্ছাচারিতা নারীর মন সংসারের প্রতি বিরূপ করেছে। কিন্তু জীবনের সমস্ত রকম প্রতিকূলতাকে তারা দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলাও করেছে। আবার প্রতিকার না পেয়ে পেয়ে নিজের ভাগ্যকে মানতে শিখে স্বকৃত বিভৎস ঘটনা গুলি অবলিলা ক্রমে ব্যক্তও করেছে এরা। যে অভিমানের জ্বালা, অবহেলার যন্ত্রণা, বিশ্বাসঘাতকতার বেদনার আগুন তাদের মনে অহরহ জ্বলছে তার-ই পরিণাম এই নৃশংসতা। আর এরও পরিণাম সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট বলে কোনো মিথ্যা পাপের ভয় এদের জড়িয়ে ধরেনা। নিজেদের কৃতকর্মের জন্য এরা বিন্দুমাত্র দুঃখিত বিচলিত বা অনুতপ্ত নয়। অথচ কিছুতেই পাপীর দলেও এদের ফেলা যায় না। এদের কচি মুখ, সরল চোখ, নির্মল হাসি এই কথাই প্রমাণ করে যে এরা পরিস্থিতির শিকার। কখনোই জন্ম-অপরাধী নয়। স্বামীর থেকে পেয়েছে নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের সম্ভাবনাহীন জীবন। অসচেতন ভাবে সেই নির্ভরতা আদায়ের দাবীতেই তাদের এই পদক্ষেপ, কঠিন প্রতিবাদী পদক্ষেপে যা স্বাধীনতা পূর্ব এক শ্রেণীর নারীর সমাজও কারাজীবনের পরিচয় বহন করে। কিন্তু পরাধীন ভারতের দেশের সংকত তাদের মনকে ছুঁতে পারে নি। গান্ধীজীর অনশন, চরকার অর্থ নিয়ে মাথা ঘামানোর মত মানসিক জাগরণ তাদের ছিল না। সমাজ আর সংসারে পরাধীনতার মধ্যেই যাদের জন্ম আর মৃত্যু, বাঁচা মরার সংকতে যাদের মন আচ্ছন্ন, তার থেকে মুক্তির কামনাই তাদের মূল লক্ষ্য হয়েছে, দেশের পরাধীনতার দিকে তাদের মনোযোগ না থাকারই কথা। ৪২-এর আন্দোলনের কোনো ঢেউ এদের মনকে আলোড়িত করে নি। নিজের অধিকারতুকু দৃঢ়তার সঙ্গে আদায়ের কথা এরা ভাবতেই পারে না। যা করেছে মরিয়া হয়ে। ফলে অপরাধীর তকমা লেগেছে তাদের দেহে। এই হল স্বাধীনতা পূর্ব দেশের অতি সাধারণ নারীদের জীবন ও মনের চিত্র। যারা দেশের জন্য চিন্তার কথা জানেনা আবার দেশও যাদের সম্পর্কে ভাবিত নয় অথচ দেশের বেশীর ভাগটা জুড়েই যাদের নীরব অস্তিত্ব।

২

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হল। কিন্তু ততদিনে কম্যুনিস্তদের ভাবনা-চিন্তা চারিদিকে নিজের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। স্বাধীনতার পর এই মতাবলম্বীদের জেলে ভরা শুরু হয়। কারণ দেশে উক্ত দলকে বে-আইনি ঘোষনা করা হয়েছিল। আর সুরমাদেবী এই দলের সদস্য হবার সুবাদে ১৯৪৯ সালের ৩১-এ অগাষ্ট শিলং জেলে বন্দী হন। পরে (বর্তমানে স্বর্গত) শিল্পী ঋত্বিক ঘতকের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

পরাধীন ভারতের রাজনৈতিক মহিলাবন্দী শ্রীমতী চন্দের পরে স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক বন্দী শ্রীমতী ঘতকের চোখে সাধারণ বন্দিনীদের জীবন কাহিনী বর্ণিত। সাধারণ অসহায় পাহাড়ী মেয়েদের নানা যন্ত্রণা তাঁর মনে যে সহানুভূতি ব্যথা ও প্রতিবাদের ঝড় বইয়ে দিয়েছিল তা-ই স্মৃতির সরণী বেয়ে ডায়রীর আকারে ব্যক্ত হয়েছে সহজ সরল ভাষায়। অবশ্য প্রসঙ্গত বীরভূমের মেয়েদের বঞ্চিত জীবনও তাঁর কলমে ধরা পড়েছে। জেলের মধ্যে নিপীড়িত মানুষগুলির যন্ত্রণা, পাগলা বা পতিতাদের করুণ অবস্থা—সমাজ যাদের প্রতি নিজের দায়িত্ব শিকার করে না, আবার সমাজের জন্যই যাদের এমন মর্মান্তিক পরিণাম তার জীবন্ত উপস্থাপনায় হৃদয় আলোড়িত হয়ে ওঠে। সুরমা দেবী এদের অসহায়তা নিজের গ্রন্থে এই ভাবে মেলে ধরেছেন—*"ওদের সঙ্গে আমরা মিশেছি ওদের আমাদের পথ দেখানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু তবু খারাপ লাগে এই কথাটা ভাবলেই—বাইরে যদিও ওরা যাচ্ছে কিছুটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তবু বাইরে ওদের প্রত্যেককেই আবার পুরনো জীবনের পুনরাবৃত্তি করতে হবে বাঁচার তাগিদে। আবার ওরা রাত্রির অন্ধকারে চুপি চুপি শুরু করবে কানির ব্যবসা। কেউ করবে চুরি। কেউ করবে অন্য কিছু। যদিও ওদের সবারই সঙ্গে আলাপ করে বুঝেছি ওরা কেউ এমন ভাবে বাঁচতে চায়না। তবু বাঁচার তাগিদ যে জীবনে সব চাইতে বড়।"* (শিক্ষ্যক্ষ্যক্ষ্যপৃক্ষ্য ২৯)।

এটাই মূল কথা। সম্মান ও স্বীকৃতির সঙ্গে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে প্রবল। সেইখানে বারবার বাধা পেলে মানুষ আর স্বাভাবিক আচরণ করতে পারে না। তার প্রত্যাশাও সমীচীন বলে মনে হয় না। এই অঞ্চলের মেয়েরা স্বেচ্ছায় স্বামী ছেড়ে কিম্বা স্বামী তাদের ছেড়ে গেলে অথবা মারা গেলে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে জীবন নির্বাহ করে, সন্তান পালন করে। তা সে য ভাবেই হোক। তাই কংইও, থাকে, ক্যান্যোদের জীবন—বাধ্য হয়ে নানা সাদা কালো পেশায় কাটে। শ্রীমতী ঘতক বলেছেন *"দিলমায়া দিদি কুমার ও ফুলমতীকে মানুষ করার তাগিদে আবার করবে আফিমের ব্যবসা। ইন্দ্রমায়া দিদিরও স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়ার ছিচ্ছে নেই। দোকান দেওয়ার ইচ্ছা"*। রোজমেরীর মায়ের সামনে সন্তান প্রতিপালনের জন্য দুটি পথ—*"হয় তো আবারও তেমনি কোনো মাদ্রাজীর সঙ্গে ঘর বাঁধার চেষ্টা করবে। হয় তো বা চেষ্টা করবে কোনো*

রকম কাতকরে দিন গুলো কাতিয়ে দিতে।" কিন্তু প্রশ্ন তগে পারবে কি? তবু এদের নিতের পায়ে দাঁড়ানোর প্রয়াস তো লক্ষিত হয়। 'তোনা ফাতকে'র সমাতেএ ভাবনা কল্পনারও অতীত ছিল। সুরমা দেবীকে এরা বলেছে *"দিদি আর কখনো এ কাত করব না। তেলে এসে যে শাস্তি হল, হাড়ে হাড়ে তা বুঝলাম। বাইরে গিয়ে অন্য কাত করার চেষ্টা করব।"* (শিক্ষ্মতেক্ষ্মডাক্ষ্ম পৃক্ষ্ম৩১) শ্রীমতী চওও তেলের বওীনীদের নিতেদের আদর্শে উদ্বুঃ করার চেষ্টা করে ছিলেন। কিন্তু তম্মসূত্রে সংসার সূত্রে যারা পরাধীন তাদের চিত্ত তগরণ সহত তো নয়! এদের বেশীর ভাগেরই দেশের স্বাধীনতার বিষয়তাও তাই হৃদয়ঙ্গম করা খুব একতা সহত ছিলনা। স্বাধীনতার অর্থই তো তাদের আয়ত্তের বাইরে।

দেশে এই খাসিয়া মেয়েদের প্রত্যেকের তমিতমা থাকলেও তাতে পেত ভরে না। তাই তাদের শহরে আগমন। কিন্তু ওদের আভিত্যের অভিমান নেই। ফলে তীবন ধারণের তন্য যে কোনো বৃত্তিই অবলম্বন করতে পারে তাদের মর্তিমতো। তবে 'ত্রেইবুল্লা' বা দিনমতুরির মতো কাত ওদের অপছণ্ড। নৈতিকতাকে ওরা তেমন গুরুত্বও দেয় না। পতিতাবৃত্তি ওরই মধ্যে পছণ্ডের তীবিকা। সমাতের ভ্রুকুতি চোখ রাখানী বা শাসন তাদের চলার পথের প্রতিবন্ধক তো নয়ই বরং বংশানুক্রমিক বৃত্তি কারো কারো। তাই এদের পিতৃপরিচয়ে শিখ পাঞ্জাবী মুসলমান পিতাদের খোঁত মিলবে। যদিও সামাতিক স্বীকৃতি অমিল। সুণ্ডরী লাবানেকে বিয়ে করে এক অসমীয়া মুসলমান। তম্ম হয় বোনাতির। কিছুদিন তীবনতাকে পছণ্ডমতো ভোগ করে পরে বাড়ির পছণ্ডসই মেয়ে বিয়ে করে সমাতস্বীকৃতি নিশ্চিন্ত সংসার পাতে ব্যক্তিতি। হয় তো ভবিষ্যতে সমাতের গণ্যমান্য তনের তালিকাভুক্ত হয় মানুষতি, কিম্বা সমাত সংস্কারক। মুসলমানতির কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য না পেয়ে লাবানের অবলম্বন হয় পতিতা বৃত্তি। এই প্রতারণা সমাতের সরল দরিদ্র যে কোনো কন্যার সঙ্গে যে কোনো কামলিপ্সু পুরুষ করতে পারে। আমাদের অতীত ইতিহাস তনায় পুরুষের বহু নারীর সঙ্গ লাভ এক সময় সমাতসম্মত ছিল। পরবর্তিকালে নিয়মের অনুশাসনে মুসলমান পুরুষও সহতে একাধিক বিবাহ করতে পারে না। হিণ্ডু পুরুষের বহু বিবাহ এক সময় খুব স্বাভাবিক আচরণ হলেও আত সে প্রথা নিষিঃ। কিন্তু অভ্যন্তরের এই প্রবৃত্তি কোনো বিধি নিষেধের আয়ত্তে আসে না বলেই বাঁকা সোত্ত নানা উপায়ে বাসনা চরিতার্থ করার পথ সমাত পুরুষকে করে দিয়েছে। তাই বিয়ে অনেক সময় পবিত্র বন্ধন না হয়ে তৈব ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায় মাত্র। এমন কামনার শিকার হওয়া কত নিষ্পাপ মেয়েই পরে আর সমাতেমাথা তুলে দাঁড়াতে পারে নি। সমাতের বা কারাগারের অন্ধকার ত্তাৎই হয়েছে তাদের এক মাত্র আশ্রয় স্থল।

অথচ এই 'বোনাতির মা'দের নারীত্বকে এত অপমান কারার পর, তাদের তীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার পরও এই অন্যায়ের বিরুণ্ডে আণ্ডন তেলে ওঠে না এদের মনে। দেশ স্বাধীন হলেও মানুষ তার প্রবৃত্তির থেকে তো স্বাধীন হতে পারেনি সম্পূর্ণ ভাবে! কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীনও হতে হয় নি তাদের, তাই নারীর আর্ত ধ্বনি ভেসে বেড়াতে দেখি আকাশে বাতাসে।

সুরমাদেবী তাঁর সমকালীন সমাতের পরিচয় তুলে ধরেছেন এই ভাবে, "সমাতের শাসন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়। যে মেয়ে কোনো অপরাধ করেনি দশতন মেয়ের মতই সুখী হতে চেয়েছিল তীবনে, নিষ্কলুষ ছিল অন্তর—ওকে অপমান করার—তীবনের দুর্দশা তেনে আনার তন্য সমাতের চোখ তো অপরাধীর বিরুণ্ডে লাল হয়ে উঠল না। কারণ সমাতের কর্তারা কে? প্রধানত যাদের আছে তাকার তের, নেই কোনো আদর্শের বালাই, তারাই তো?" (শিক্ষ্মতেক্ষ্মডাক্ষ্ম, পৃ ৬৩-৬৪)।

এখনও এই ব্যবস্থার খুব পরিবর্তন নতরে আসে কি? তপনিবেশিক আধা সামন্ততান্ত্রিক সমাত ব্যবস্থার কাঠামোতে ধরা ভাঙনের পরিচয় মেলে শিলং তেলের ডায়েরির বণ্ডীদের অবস্থার বর্ণনায়। অর্থনৈতিক সংকত, বেকারী, বুভুক্ষা, দারিদ্র অশিক্ষা প্রভৃতি এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। এই ব্যবস্থাই তম্ম দিয়েছে চোর খুনী ডাকাত পাগলদের। রাতনৈতিক বণ্ডীদের সাথেই এদের অবস্থান। শুধু উক্ত বণ্ডীদের একতা স্বতন্ত্র ঘরে বন্ধ রাখা হত। চেস্তা থাকত অন্য কয়েদিদের থেকে দূরে রাখার। কিন্তু দুঃখীতনকে সহানুভূতিশীল মন থেকে দূরে রাখা কখনও সম্ভব তো নয়! আলোচ্য তিন রাতনৈতিক বণ্ডীদের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোত্ত।,

শিলংয়ের সাধারণ চুরি মদ আফিমের কেসের কয়েদিই বেশী। কারণ অর্থনৈতিক দুর্দশা ও সংকত। বেশীর ভাগ খাসিয়া মেয়েরই তীবিকা নির্বাহের একমাত্র পথ আলু কমলা পান সুপারী তেতপাতা বিক্রি করে দিন কাতানো। কিন্তু তাতে তো পেত ভরে না। তীবনে বাঁচার তাগিদে এরা আসামীতে পরিণত। তেলে দাগী আসামীর সংখ্যা দু একতা। খুনী কেসের মেয়েদের সঙ্গে মিশে কারো কারো সম্পর্কে সুরমাদেীর মনোভাব *"যত মিশলাম, ততই মনে হল ও কেমন করে খুন করতে পারে?"* (শিক্ষ্মতেক্ষ্মডাক্ষ্ম পৃক্ষ্ম ১১)। শ্রীমতী চণ্ডের ভাবনার প্রতিধ্বনি নয় কি উক্তিতি? যদিও ওদের সমাত তীবন ভিন্ন। ওরা এখোনো মাতৃতান্ত্রিক সমাতে বাস করে। সমাতের অগ্রণী অংশ ওরা। আমাদের মেয়েদের মত নির্যাতিত ও পরাধীন নয়। অর্থনৈতিক ভাবেও স্বাধীন। এই স্বাধীনতার ছাপ তাদের তীবনের প্রতিতি ক্ষেত্রে লক্ষিত হয়। খুশী মত বিয়ে করে খুশী মত স্বামী-স্ত্রীকে স্ত্রী-স্বামীকে ছাড়ে। নৈতিক কড়াকড়িতে ওদের তীবন পিষ্ট নয়। তবু এই ছবিই পুরো কথাতা বলেনা।

সুদূর নেপালের ইন্দ্রমায়া অল্প বয়সে সন্তান কোলে স্বামী পরিতক্তা। আসামে এসে আবার বিয়ে করে সুখী ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় স্বামী হঠাৎ পাগল হয়ে যাওয়ায় নিতের পায়ে দাঁড়াতে চুপি চুপি আফিমের ব্যবসা ধরে। ধরা পড়ে প্রথমে গৌহাতি তেলে তার পরে শিলং তেলে স্থান হয়। তিন বছরের তেল। অথচ নিরূপায় হয়ে তাকে এই বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়। তনবার শিখবার নিতের পায়ে দাঁড়াবার অদম্য ইচ্ছায় তেলের ভিতরে যেতুকু সুযোগ সে পেয়েছে নিতেকে শিক্ষিত করেছে।

স্বামী খুন করে হাজতে হেরমণ। সুশ্রী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দিদিসুলভ আচরণ তার। স্নিগ্ধ চোখের চাওনি ও মিষ্টি হাসিতে মন জয় করত সবার। ওকে নিয়েও মনে প্রশ্ন-কেমন করে যে খুন করল ও? তবু এদের একজাই বাস্তব পরিচয় এরা অপরাধী।

শিলং-এর জেলে পাগলদের পৃথকীকরণের প্রচেষ্টা ব্যর্থ। বন্দীদের বারবার আপত্তি সত্ত্বেও পাগলদের স্থানান্তরিত করা বা চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করার কোনো উদ্যোগই নেওয়া হত না। এদের জীবন যন্ত্রণা উপলব্ধি করার মানসিকতা লক্ষিত হয় নি। কেউ জানতে চায় নি তাদের এই অবস্থার কারণ। এই ব্রাত্য মানুষগুলির ভালো থাকার প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা নেই কর্তৃপক্ষের। না মেলে সুচিকিৎসা না পাওয়া যায় ন্যায্য অধিকার। ধর্মঘতের মাধ্যমে জীবনের অতি ক্ষুদ্র প্রয়োজনীয় জিনিসজিও অর্জন করতে হয়েছে বন্দীদের। শুধু যে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের সামাজিক চিত্র এজি তা নয়। তার পরবর্তীকালে এই চিত্র আরো অবর্ণনীয় দুঃসহ রূপ ধারণ করেছে।

এই অপরাধীরাই যখন জেলে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে বড়দিন, New Year, একুশে ফেব্রুয়ারী কিম্বা স্বাধীনতা দিবস উৎসাহের সঙ্গে পালন করেছে তখন তাদের অন্তরজি ফুটে উঠেছে। বন্দীদের এক জেল থেকে আর এক জেলে স্থানান্তরিত করার সময় বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় তাদের হৃদয় উদ্বেলিত হয়েছে। সুরমাদেবী দেখেছেন—নিয়মিত বেতন না পেয়ে কর্মচারীরা কাজ ছেড়ে দিয়েছে। কোনো কেস খোলা আদালতে বিচার করার সাহস কর্তৃপক্ষের নেই। ইচ্ছাকৃত অনিয়ম বা অন্যায়গুলি ধরা পড়ে যাবার ভয় প্রতি মুহূর্তে আতঙ্কিত করে রাখত তাদের। এই পথে উন্নত সমাজের কল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারে কখনো?

পরবর্তীকালে সাঁইথিয়ার স্কুলে শিক্ষকতার সূত্রে এসে বীরভূমের মেয়ে ও সমাজের আইন শৃঙ্খলার দৈনদশা তাঁকে কষ্ট দিয়েছিল। তিনি বলেছেন জেনে *"পুলিশ পার্তি এসে লাঠি দিয়ে মেয়েদের গুঁতো দিয়ে জিজ্ঞেস করত দু'কেজির বেশি আছে?" সমস্বরে মেয়েরা বলত 'না না'। এবং প্রত্যেকে কুড়ি পয়সা করে বের করে দিত। দু কেজির বেশি চাল নিয়ে যাবার নিয়ম নেই। পুলিশ জানে দু কেজির বেশি আছে। মেয়েরাও জানত কি করতে হবে।"* (শিক্ষ্মক্কেক্ষ্মডাক্ষ্ম, পৃক্ষ্ম ৫)। এর পরে ছিনতাই পার্তির সঙ্গেও একই দৃশ্য অভিনিত হত। পয়সা নিয়ে তারা চলে যেত। এই দরিদ্র মেয়েরা বহু বছর আগের শিলং জেলের খুনী পাগলী ও পতিতা মেয়েদের অসহায় স্মৃতি বয়ে এনে সুরমাদেবীর আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াতে শুরু করত।

গোজা সমাজের সমস্যাজা বেকারত্ব ও পুলিশি ব্যাবস্থার ভন্ডামীর দিকেই তো অঙ্গুলি সংকেত করে। বেকার যুবকদের প্রায় অলিখিত আইনে অপরাধী আর গুন্ডা করে তুলেছে শাসন ব্যাবস্থাই তো! অর্থনৈতিক সংকজও যুবকদের এই পরিণতির কারণ। কোন স্বাধীন ভারতের চিত্র এজি? যেখানে অন্নের প্রয়োজনে যে কোনো অপরাধকে বৃত্তি রূপে গ্রহণ করতে হয় সমাজপতি ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষকদের নীরব সম্মতি ক্রমে?

শুধু আসামের মেয়েরাই নয় সাঁইথিয়ার বাড়ীতে যে মেয়েরা কাজ করত তাদের জীবন যাপনও যুগের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে, যদিও তারা কারাবাসিনী নয়। কিন্তু দরিদ্র সমাজে অসহায়তার দলিল নিয়ে তারা উপস্থিত। তাই এদের প্রসঙ্গ খুব একজা অবান্তর হবে না। এরা সাধারণত বিয়ের দিনই ফ্রক ছেড়ে শাড়ী পরে বিয়ের আসরে বসত। এর থেকে দুজো কথা স্পষ্ট—প্রথমত এদের খুব অল্পবয়সেই বিয়ে হত। দ্বিতীয়ত আর্থিক অবস্থা উন্নত নয় তাই বিয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কাজকরে যেতে হত। কিন্তু এক বছর বা অল্প দিনের পরেই বর আর তাদের নিত না। কারোর কোলে হয়ত একজি বাচ্চাও এসে যেত। কিন্তু সংসার করার সুযোগ বা ইচ্ছাজা সম্পূর্ণ নির্ভর করত বরের ইচ্ছার উপর। এবং অধিকাংশ সময়েই সে ইচ্ছা দীর্ঘ স্থায়ী হবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মেয়েরা কোনো জেহাদ ঘোষণা করতে জানত না। পুরো ব্যবস্থাজাই খুব স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছিল। ফলে স্বামীর জীবন থেকে পরিত্যক্ত হবার পর আবার তারা কেউ কেউ খুব স্বাভাবিক ভাবেই পুরনো কাজে নিযুক্ত হত। কেউ বা অল্প মেয়াদী সংসার জীবনের জন্য দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হত।

মেয়েদের এই জীবনযাত্রা উজ্জ্বল সমাজের আশা মনে জাগায় কি? এদের প্রতি অন্যায় আচরণে মন বিচলিত হয়ে ওঠে। মেয়েদের আত্মসচেতনতার অভাবে সুরমা দেবীও অসহিষ্ণু। কিন্তু আমাদের সামন্ত সমাজে আবহমান কাল ধরে নারী পুরুষের কাছ থেকে শুনে বিশ্বাস করে আসছে—'সে' সব বিষয়ে নিকৃষ্ট, যত অমঙ্গলের স্রষ্টা। নারী বুদ্ধি সর্বনাশের কারণ। যুগ যুগ ধরে এই সব পুরুষের মন গড়া কলঙ্কের ভাগিদারিনী হয়ে খুব স্বাভাবিক ভাবেই গ্রামীণ নারীর মানসিকতায় হীনমন্যতা বোধ জন্ম লাভ করে। নারীর নিজস্ব চিন্তাকে প্রাধান্য দিতে না পারার এজাই মূল কারণ।

সমাজের সর্ব স্তরের সব মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা যাঁদের স্বপ্ন, তাঁরা যখন বোঝেন সমাজের একজা শ্রেণী নিজের অধিকার সম্পর্কেই সচেতন নয়, বিশেষ করে যাদের ওপর দেশের ভবিষ্যতের তজ্জ্বল্য অনেকখানি নির্ভরশীল তখন বর্তমান অবস্থায় হতাশ হয়ে, ভবিষ্যতের সাফল্যের প্রতিক্ষায় থাকা ছাড়া উপায় কি? কিন্তু সুরমা দেবীদের স্বপ্ন আজও শেষ হয়েছে কি? পেয়েছেন তাঁরা স্বপ্নের জগৎ? এর পরিচয় পাবো শ্রীমতী মীনাক্ষী সেনের হাজতি নম্বর মেয়াদী নম্বরের পাতায়।

৩

নকশাল আন্দোলনের সমর্থক হবার কারণে শ্রীমতী মীনাক্ষী সেনের কারাবাস অবশ্যম্ভাবী ছিল। ১৯৭৪ সালে তাঁকে কারায় বাধ্যতামূলক আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। বিভিন্ন মেয়াদের নানা ধরনের অপরাধিনীদের অপরিসীম যন্ত্রণার সাক্ষী ছিলেন তিনি। তাঁর অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি গল্প গাছা করার রীতিতে সহজ ও স্বচ্ছ দৃষ্টি ভঙ্গির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন শ্রীমতী সেন তাঁর গ্রন্থে। 'হাজতি নম্বর মেয়াদী নম্বর' পর্বতিতে নিরপরাধ বন্দী দশা, বিচারাধীনের দুঃখ, দন্ডিতের অস্বাভাবিক ও অবাঞ্ছিত জীবন যাপন এবং শিশুদের দুঃসহ দিন রাত্রির যে জীবন্ত চিত্রণ উপস্থিত তা পাঠক হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে। সমাজের আপাত অগ্রগতির আড়ালে এমন পুতি গন্ধময় অন্ধকার জগতের পরিচয় আমাদের আতঙ্কিত করে। দেশ ভাগ হবার ফলে উদ্বাস্তু পরিবার—যারা বাংলাদেশে অতি সাধারণ জীবন যাত্রায় তৃপ্ত ছিল। এ দেশে এসে নিদারুণ দারিদ্র্য ও কঠোর জীবনযাত্রার সম্মুখীন হয়েছে—তাদের মর্মন্তুদ কাহিনীর উপস্থাপনাও হৃদয়ে আঘাত হানে যখন দেখা যায় নিরপরাধ হয়েও পরিস্থিতির শিকারে কিশোরী বা তরুণীরা অপরাধীর তকমা সহ দুঃসহ কষ্টের জীবন বয়ে বেড়াতে বাধ্য হচ্ছে।

আমরা পূর্বেও দেখেছি সমাজে নারীরা পুরুষ দ্বারা প্রতারিত হয় সহজেই। 'জেনানা ফাতকের' সময় এই অত্যাচার বা প্রতারণার আধিক্য ছিল। কিন্তু সমাজে পুরুষের জৈব প্রবৃত্তি চরিতার্থ হবার সাদা কালো নানা উপায় স্বীকৃত থাকায় সরাসরি নারী প্রতারণা কম ঘটেছে। শিলং এর মেয়েরা কিন্তু ভাল-মতই প্রতারিত হত পুরুষ দ্বারা। অত্যাচারিত তো হতই।

মীনাক্ষী সেনের ক্যানভাসে দেখি এই প্রতারণা বহু গুণে বেড়েছে। প্রতারকের দল কখনও নিজের অভিভাবকদের সমর্থন, কখনো অর্থ ও প্রতাপের মাধ্যমে আইনের সমর্থন পেয়ে সমাজে নির্দ্বিধায় ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। আর ভালোবেসে বিশ্বাস করে প্রতারিত হবার অপরাধে নারীর দল শাসনের শৃঙ্খলায় আবদ্ধ হয়ে কাঙ্ক্ষিত জীবন যাপন থেকে বঞ্চিত হয়ে অবাঞ্ছিত বন্দী-জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে।

প্রতারিত ভবিষ্যৎ নির্ধারণ এবং নিয়ন্ত্রণের ভার সমাজ যে পুরুষের হাতে সঁপেছে বহু দিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথ সে সংবাদ আমাদের দিয়েছিলেন 'বিচারক' (১৯০১) গল্পের মাধ্যমে। সমাজ ব্যবস্থার তাঁতাকলে নারী যে সব সময় পিষ্ট হচ্ছে যে কথাও প্রমান করে উক্ত গল্পটি। বাল্যবিধবা হেমশশীকে আধুনিক শিক্ষায় তরুণ মোহিতমোহনই নতুন স্বর্গের স্বপ্ন দেখিয়ে গৃহচ্যুত করে। পরে আশ মিটে গেলে তাকে পরিত্যাগ করে 'ক্ষীরোদা'র পরিণত করে। এরপর থেকে 'রসিক পুরুষ' বারবার ক্ষীরোদাকে গ্রহণ বর্জনের পালা চলতে থাকে। ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা আর সহ্য না হওয়ায় তার আটত্রিশ বছরের জীবন আর তিন বছরের শিশুসহ কুঁয়োয় ঝাঁপ দেয় ক্ষীরোদা। এবং সন্তান হত্যার দায়ে তার কারাবাস হয়। কেন কি করে সে এ কাজটি করেছে তা কেউ জানতে চায় নি। জজের কঠোর রায়ে তার এ অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। অতএব মৃত্যুদন্ড তার প্রাপ্য। কিন্তু নিয়মনিষ্ঠ সাত্বিক জজ উক্ত রমণীর কাছে নিজের তরুণ বয়সের ছবি ও ছদ্মনামাঙ্কিত আংটি পেয়ে স্তব্ধ। যৌবনে কত নারী-সঙ্গ ভোগ করে, কত কিশোরী তরুণীর সরল বিশ্বাস হত্যা করে তাদের অন্ধকারের পথ দেখিয়ে তিনি আজ তা ভুলেও গেছেন আর ন্যায়নিষ্ঠ ধার্মিকে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু হেমশশীর জীবনের পরিণতিতে আন্তরিক ভালোবাসা আর সরল বিশ্বাসের মৃত্যু দেখে তিনি বিচলিত। প্রতারিতা নারীর মনে তাঁর মত প্রবঞ্চকের প্রতি আজও ভালোবাসার গভীরতা উপলব্ধি করে নারী সম্পর্কে শ্রদ্ধা জেগেছে তাঁর মনে। মোহিতমোহনের সামান্য আনন্দ উপভোগ, না জানি কত ক্ষীরোদার জীবনের নিষ্ঠুর পরিণতির কারণ। পঞ্চাশ একশ বা তার বেশী বছরেরও পূর্বের সমাজের কলুষিত দিক ও নারীর অসহায় আত্মসমর্পণের চিত্র ১৯৪০, ১৯৫০, ১৯৭০ এবং তার পরেও সমসাময়িক। পুরুষের চিত্র মোহিতমোহন ওরফে বিনোদভূষণের মত। নারীর প্রতারিত হওয়া আজও হেমশশী ওরফে ক্ষীরোদারই মত। আজও সরল বিশ্বাস ও অকৃত্রিম ভালোবাসার অপরাধের দণ্ড নারীই ভোগ করে। দেশের রাজনৈতিক প্রশাসনিক পরিবর্তন এই নারীদের জীবনের ইতিহাসে বদল আনে না। ৪২ এবং ৪৯ এর দশকের নারীদের জীবন-অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমতী সেনকে আশ্রয় করে এই পরিচয় সুস্পষ্ট করে নেওয়া যাবে।

এরকমই এক প্রতারিতা গর্ভবতী তরুণী শিবানীদি। সব প্রতারিতারাই পুরুষকে বিশ্বাস করেই বঞ্চনার শিকার হয়। শিবানীদির ক্ষেত্রেও এ পর্যন্ত কোনো গরমিল নেই। কিন্তু প্রবঞ্চিত হয়ে মেয়েরা নিজের ভুলতা বোঝে। অথচ প্রেমাস্পদের প্রতি অতল বিশ্বাস শিবানীদির চোখ এবং মন একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিল। পুজারী ব্রাহ্মণের খুঁড়িয়ে চলা সংসারের জ্যেষ্ঠা কন্যার কাছে স্কুল শিক্ষকের কথা দেওয়াটাই সব চেয়ে বড় বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল। সুখ স্বপ্নে বিভোর শিবানীদির জানা বাকি ছিল সমাজে 'গরীব মেয়ে' মানেই 'চরিত্রহীন'। তাই কোর্টে সর্বসমক্ষে তার সন্তানের পিতা তাকে চিনতেই অস্বীকার করে। যে কোনো নারীর পক্ষেই এ চরম আঘাত। শিবানীদির কাছে তো কল্পনাতীত। কিন্তু অশিক্ষিত শিবানীদির দৃঢ়তা সম্পন্ন নিজস্ব বিচার বোধ আইনের সব প্রচেষ্টাকে তুচ্ছ করেছে। হাকিম তার ন্যায্য অধিকারের কথা বললে শিবানীদি নিজের অনড় সিদ্ধান্ত সাবলীল ভাবে জানিয়েছে *"আমাকে ও গ্রহণ করবে কিনা সে প্রশ্ন এখন অবান্তর। আমি ওকে ত্যাগ করলাম হুজুর! ও চাইলেও ওর ঘরে যাবো না আমি।"* (হাক্ষ্মনক্ষ্মমেক্ষ্মনক্ষ্ম, পৃক্ষ্ম ৮৯)। কারণ সে তার সন্তানের পিতা হবার যোগ্যই নয়। অন্তরের সরলতার শুদ্ধতায় ও দৃঢ়তায় শিবানীদি আমাদের মুগ্ধ করে। পুরুষের হীন আচরণের বিরুদ্ধে তার ধিক্কার এবং প্রতিবাদ আমাদের মনে শ্রদ্ধা জাগায়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষীরোদারা, শ্রীমতী ঘটকের সাঁইথিয়ার অসহায়তারা প্রতিবাদ করতে জানত না, খাসিয়া মেয়েরা তো জন্ম স্বাধীন। যদিও তা বলে অত্যাচার থেকে রেহাই পেয়েছে তারা এমনতা ভাবা ভুল। মীনাক্ষী সেনের সময় শিক্ষার প্রসার, আত্মসচেতনতা বেড়েছে। সামন্ত ভাবনার শিকলও ছিন্ন হতে শুরু করেছে। তাই শিবানীদির মত চরিত্র স্বল্প হলেও নজরে আসে। তবু এযুগেই শোভা কাজল শ্যামলীদির মতো প্রতারিত অত্যাচারিত মেয়েরা শিবানীদির মত ভাবতে পারে না। কারণ তারা চায় ঘর, আশ্রয়, নাম, পরিচয়, আইনি বিবাহ। শিবানীদির মত তাদেরও চোখে নিজস্ব সংসারের

শান্তির নীড়ের স্বপ্ন মাখা। কিন্তু সমাতে তাদের কোনো তয়গা থাকে না। তারা বিনা অপরাধে অপরাধীর তীবন কাতাতে বাধ্য হয়। বেছে নিতে হয় পঙ্কে ভরা অসম্মানের পথ। তাই একবার প্রতারিত হয়ে সারা তীবন ধর্ষিতা হতে প্রস্তুত হয়, বিবাহের মাধ্যমে তীবনের অতি স্বাভাবিক পাওনাতি পুরুষের বিকৃত মানসিকতার ফলে আইনের সাহায্যে আদায় করে নিতে হয় তাদের। সব সময় অবশ্য সে ইচ্ছাও পূরণ হয় না। কিন্তু কখনই আইনের সহায়তায় ঐ পুরুষের শাস্তি কামনার কথা তাদের মনেও আসে না।

আতকের দিনের সমস্যা আরো ভয়াবহ। গণধর্ষিতা কিশোরী পুনরায় ধর্ষিতা হয়। আইনের সাহায্যে কার সংসারে যাবার দাবী তনাবে সে? ৬৯ বছরের শ্বশুর পুত্রবধূকে ধর্ষণ করলে কার স্বামীত্ব গ্রহণ করবে বধূতি? কোনো অঞ্চলের উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী অন্যায়ভাবে কাম চরিতার্থ করে ধিকৃত। কি হবে এর পরিণাম? বর্তমানে মানুষ খুবই সচেতন। নারীরাও অন্যায়ের বিচার দাবী করছে। তাই ইমরানার মত মেয়েরা সুবিচারের স্পর্শ পাচ্ছে কেউ কেউ। অর্থ ও প্রতিপত্তি সত্ত্বেও তেসিকা লাল কে হত্যা করে রেহাই পায় না মনু শর্মা ও তার দুই সঙ্গী। কিন্তু সমাতের ঘতনা গুলি যততুকু বিচারের আলোয় স্পষ্ট তার অনেকতাই অন্ধকারে পথ হারায়। যে ঘতনা, দুর্ঘতনা কিম্বা অপঘতনা সংবাদ মাধ্যমে প্রচারের আলোয় পড়ে, অনেকত কষ্টে তার বিচার সম্পন্ন হয়। অধিকাংশই যায় অন্ধকারে তলিয়ে। প্রকাশিত ঘতনাগুলি একথাই প্রমাণ করে যে বহু বহু বছরের পুরনো প্রবৃত্তির বিভৎসতার সমস্যা তার অতি ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে একবিংশ শতাব্দীতেও উপস্থিত।

হৃদয়ের গভীরে ভালোবাসা নামক অনুভূতিকে ঘিরে মানব মনের রহস্যময় আচার আচরণ, মনের মধ্যে হাতার সংস্কারের বাধন, শরীরের একবার স্পর্শেই তীবন সঙ্গী মেনে নেবার বাধ্যতা বোধ, যুক্তি ও বিশ্বাসের দ্বন্দ্বে অসহায়তা বোধ এই নানা ততিলতা শুধুমাত্র নারীদের মনকেই আক্রান্ত করে। বাস্তব সত্য হল এই তেলের চার দেওয়ালে কোনো সুবিচার সুলভ নয়। আর এই লৌহ শৃঙ্খলের বাইরেও অবিচারের কারণেই তাদের কোনো আশ্রয় নেই। নিরাপদ আশ্রয়ের নামে সমাতব্যাবস্থার উপহার অসহ্য বণ্ডী তীবন। নদীর যেমন সাগরে মেশা অবশ্যম্ভাবী। তেলের পথও নারীকে তেমনি অনিবার্য রূপে দেখায় পতিতা পল্লীর পথ। আইন আদালতের বাদান্যতায় অধিকাংশ সময় পুরুষের মুক্তি, আর উঠতে বসতে সমস্ত ত্তাতের বিদ্রূপের তীরে বিঃ হওয়াতা মেয়েদের তীবনের পক্ষে স্বাভাবিক নিয়ম। এই যন্ত্রণা সহ্য করে কিম্বা তুচ্ছ করে দুর্লভ মানসিক শক্তির অধিকারিনী শিবানীদিরা কখনো কখনো দৃশ্যপত বদলে দেয় আচমকা।

দেশ ভাগের ফলে উদ্বাস্তু পরিবারের কন্যা মিতা আর চম্পা। বাংলাদেশের আদর্শ শিক্ষকের বুদ্ধিমতী বহু গুণ সম্পন্না কন্যা মিতা। এদেশে এসে দারিদ্র্যের ছোবলে দুর্দশাগ্রস্ত পিতার মৃত্যু। অষ্টম শ্রেণীর মিতাকে দিদির মতই অসময়ে তীবিকার্তনের পথে পা বাড়াতে হয় পড়াশোনার সাথে সাথেই। এক রাতে কর্মক্লান্ত মিতা সাঁকোর ওপর আড্ডারত অর্থবান পরিবারের পথভ্রষ্ট বেকার যুবকদের দ্বারা ধর্ষিতা হয়ে বাড়ী ফেরে না। পরে থানা হয়ে কারাগারে সে আশ্রয় পায়। দিদি বোনকে মুক্ত করতে চাইলেও এক ঘরে হয়ে অন্য মেয়েদের বিয়ে দিতে না পারার আশঙ্কায় মা তাকে ঘরে তুলতে চান না। অর্থনৈতিক নিশ্চিন্ততার অভাব কোনো মা কে যে অমানবিকতা ও স্বার্থপরতার কোন সীমায় তেনে নামাতে পারে ঘতনাতি তার ত্বলন্ত দৃষ্টান্ত। উক্ত যুবকদের অভিভাবকরা অর্থ দিয়ে মিতার মুখ বন্ধ করাতে চেয়েছিলেন। অবশ্য এ নিয়মের আতও ব্যত্যয় দেখি না। রোত রাতে বিরক্ত করে যারা আনণ্ড পেত মিতা তাদের মুখ চিনত। কিন্তু সে রাতের অন্ধকারে কারো মুখ দেখতে না পাওয়ায় সে কোর্তে সনাক্ত করে নি। সঙ্গিনীদের অভিযোগের উত্তরে সে বলেছিল, *"যা সত্যি তাই বলা উচিত আমার। ভেবেছিলাম সব ক'তন দোষী যদি আমার সাক্ষ্যের কারণে বেঁচেও যায়—একতন নির্দোষ যেন আমার ভুল সাক্ষ্যে সাত না পায়।"*(হক্ষ্মনক্ষ্মফেক্ষ্মনক্ষ্মপৃক্ষ্ম৫৪)। বিনা অপরাধে দণ্ড ভোগ করা অষ্টম শ্রেণীর কিশোরীর মুখে এমন ক্ষোভ শূন্য বাক্য উচ্চারণ, অনায়াসে ন্যায় বিচারের মূল সূত্র ঘোষনা বিস্ময়ে বাকশূন্য করে তোলে। চমকে উঠতে হয় তার পরবর্তী চিন্তার পরিচয়ে—তেলের তীবন দেখে সে বুঝেছে যুবক গুলি তেলে এলে তাদের অপরাধ প্রবণতা বাড়ত বই কমত না। কিন্তু মিতার এত বড় সর্বনাশ করেও যে তারা মিতার কারণেই মুক্তি পেল এর ফলে যদি তাদের মনে একতুও অনুশোচনা তাগে তাহলে তাদের শুধরে যাবার সম্ভাবনা সে উড়িয়ে দিতে পারে না। যে সহানুভূতিপূর্ণ মানবিক আচরণ ত্তেল কর্তৃপক্ষের হওয়া উচিত কিন্তু তাদের মনেই ঠাঁই পায় না, একতি কিশোরী তা অনায়াসে এবং প্রত্যয়ের সঙ্গে ব্যক্ত করেছে দেখে আশ্চর্য হতে হয়। আর বিস্মিত ও ব্যথিত হতে হয় এই দেখে যে-তেলের দুর্ব্যবহার, সংসারের ঘৃণা, সমাতের ব্রাত্য মনোভাব পরবর্তীকালে মিতাকে নিতের প্রতি আস্থাহীন ও শ্রদ্ধাহীন করে তুলেছে। ফলে স্বেচ্ছায় ত্তেলখানা প্রদর্শিত তমসাচ্ছান্ন তীবনের পথে সে হারিয়ে গেছে। মেধাবি বুদ্ধিমতী সৎ মিতার উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় তীবনের যবনিকা পতনে হৃদয় অস্থির হয়ে ওঠে।

দেশ ভাগের বলি আর এক উদ্বাস্তু কন্যা চম্পারাণী। কৌশলে পতিতালয়ে আনীত চম্পা বহু প্রচেষ্টাতেও মুক্ত হতে পারে নি। আর পতিতালয়ে কোনো মেয়েরাই স্বেচ্ছায় নেই। পুষ্পরা আতও মুক্তির স্বপ্ন দেখে। কিন্তু তানেনা সমাত বেচারাদের গ্রহণই করবে না। আবার ফিরে তাদের পুরনো তয়গাতেই আসতে হবে।

তামাইবাবুর দ্বারা প্রতারিতা বিদ্যা কুমারী হয়েও পুত্র সন্তানের তননী। অতি আদরের বিদ্যা পিতার কোনো সাহায্য বা সহানুভূতি পায় নি। বরং তামাতাতি তাঁর নির্বাচন বলে অহং রক্ষার্থে তাকেই সমর্থন করেছেন বিদ্যার পিতা। এই স্বীকৃতিতে তেষ্ঠা কন্যার কোন তীবন দ্বিতীয়বার উপহার দিলেন বিদ্যার বাবা ভেবে দেখেছেন কি? বিদ্যাকে বর্তন করে কোন পথে ঠেলে দিলেন তাকে বুঝতে পেরেছেন কি? অহং কখনো নিরপেক্ষতার পথ পায় না। ফলে সমাতে বিদ্যা এবং তার দিদিদের সুখ-স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। পুরুষের অপরাধের বিরুদ্ধে

প্রতিবাদ এবং প্রতিকারের ইচ্ছার জন্ম হয়না দিনের পর দিন। তাই বিদ্যাদের আশ্রয় হয় লিলুয়ার মত কোনো হোমে আর মিথ্যা মর্যাদা বজায় রাখতে ঘৃণ্য লম্পত স্বামীকে গ্রহণ করতে হয় বিদ্যার দিদিদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

দশ বছরের অহানারর কাহিনী কিন্তু অন্য খবর দেয়। দরিদ্র কিন্তু আদরের কৃষক কন্যা অন্নাভাবে ৬৫ বছরের বৃদ্ধের বাড়ীতে গৃহকর্মের জন্য নিযুক্ত হয়। বৃদ্ধের লালসার শিকার হয়ে তেলে অসুস্থ শিশুর জন্ম দেয় সে। তার ঘৃণায় এবং অমনোযোগে শিশুতির মৃত্যু হয়। কিন্তু বালিকার আব্বু আম্মির ঘরে আদরের কন্যা নিশ্চিন্ত আশ্রয় লাভ করে।

সমাজের মর্যাদা হানির ভয়ে বিদ্যার বাবা তাকে ঘরে নেন না। তিনি অর্থবান ও শিক্ষিত। কন্যাদের বিয়ে দেওয়া যাবে না বলে মিতাকে ঘরে ঠাঁই দেননা তার মা। তিনি আদর্শ স্কুল মাস্তারের স্ত্রী। এমনতাই ঘতে সংসারে। এর পাশে এই দরিদ্র কৃষক পরিবারের স্বচ্ছ ভাবনা যেন অতি স্বাভাবিক অথচ নতুন পথ দেখায়। *"ধর্ম পরিচয়ে মুসলমান, পেশা পরিচয়ে কৃষক, অর্থ পরিচয়ে দরিদ্র এবং শিক্ষা পরিচয়ে নিরক্ষর এই দম্পতি"* এই কথাতাই প্রমাণ করেন যে ধর্মের সঙ্গে অন্ধতা ও গোঁড়ামী, নিম্ন আয়ের পেশা ও দারিদ্র্যের সঙ্গে মানসিক ক্ষুদ্রতার, নিরক্ষরতার সঙ্গে কুসংস্কারের যে যোগাযোগ মানুষ নিঃসংশয়ে করে, তা অনেক সময়েই ভুল।

কখনো কখনো লোভ রিপু নীচতা ও অবিশ্বাস্য হৃদয়হীনতায় আবৃত সংস্কারের তলে তড়ানো ভয়াবহ গ্রাম্য বিবাদের মাঝে সমাজে বিশেষ করে দরিদ্র শ্রেণীর সমাজে মেয়েদের ত্রয়গাতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। অর্থের জন্য পিতা যখন কন্যাকে পন্য করে তোলে তখন কন্যার অসহায়তা সর্বাধিক। পিতা শব্দতি তখন তার গভীর অর্থ হারিয়ে শুধু একতি শব্দের মধ্যেই থমকে থাকে। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় আমাদের সমাজেই কন্যা নাকি লক্ষ্মীর সমতুল।

অর্থের লালসায় নীতিহীন এবং হৃদয়হীন শুঁড়ি খানার মালিক মাতৃহারা নিজের কন্যাতিকে ব্যবসা বৃদ্ধির খাতিরে ব্যবহার করে অর্থবান। কিন্তু গ্রাহক মনোরঞ্জন করতে গিয়ে কন্যা গর্ভবতী। অর্থ ও প্রতিপত্তির শক্তিতে গ্রামের ভালমানুষ যবুকের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়ে পিতার কর্তব্য কর্ম সাধিত। বিবাহের চার মাস পরে শিশুর জন্ম গৃহে অশান্তির কারণ হয়। এর পর শিশুর অস্বাভাবিক মৃত্যু। হত্যাকরী অজনা। কিন্তু এ কাত করল কে? বধু ? নিশ্চিন্তে স্বামীর ঘর করবে বলে? সে হয় তো সত্যিই তার পিতৃগৃহের অসম্মানজনক ভবিষ্যৎহীন জীবনজপনে অনিচ্ছুক ছিল? সত্যিই তার স্বামীর সঙ্গে নিজের একতা নিশ্চিন্ত সংসারের স্বপ্ন দেখেছিল সে? নাকি শাশুড়ীই শিশু হন্তা? অন্যায় প্রতাপের ভয়ে লাঠির কাছে নতি স্বীকার করে সন্তানবতী কন্যাকে বধু হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হলেও যে শিশু তাঁর পুত্রের নয় তাকে গ্রহণ করতে তিনি নারাত? তাই? প্রকৃত উত্তর অজনার গর্ভে। কিন্তু শাশুড়ীর চার বছরের তেল হয়েছে। অভিযোগ অপ্রমানিত, তবুও। কারণ কন্যার পিতার অর্থের প্রভাবে শাশুড়ীর অ-প্রমাণকে প্রমাণের চেষ্টা চলছে। হয়তো একই উপায়ে কন্যার প্রমাণকে বিলোপও করে ছেড়েছেন তিনি। আতও যে এই ব্যবস্থা সমাজেঅতি পরিচিত সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

শিবানীদির অকৃত্রিম ভালোবাসার পরিণাম ও পিতৃ হৃদয়ের নানা বৈচিত্র আমরা দেখেছি। উভয় প্রকৃতির ভিন্ন রকম চেহারাও সুলভ। কন্যার জীবন এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত পিতারা যতই কঠিন শৃঙ্খলে স্নেহাস্পদদের আবদ্ধ রাখুন না কেন, কন্যার পছজৈর পাত্রকে নামঞ্জুর করুন না কেন, সাহসী কন্যারা পিতার নালিশ সত্ত্বেও সাবালিকা কন্যা, সন্তান কোলে শ্বশুরের ভিতেতেই ফেরে। আর পুত্র ও স্ত্রীকে কাছে পাবার জন্য স্বামীর অধীর প্রতিক্ষারও অবসান হয়। পিতার স্নেহচ্ছায়ায় লালিতা কন্যার বিরুদ্ধাচরণ স্বভাবতই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পিতার হৃদয়ে আঘাত হানে। কিন্তু সন্তান সহ স্ত্রীকে গ্রহণ করার জন্য ব্যাকুল যে পাত্র, তার থেকে বিচ্ছন্ন করে রাখলে কন্যার প্রতি খুব সুবিচার হত কি? না যথার্থ মঙ্গল সাধনই সম্ভব হত। বাবারা বোঝেন না কেন? রীতার জীবন বৃত্তান্ত আমাদের এই প্রশ্নেরই সম্মুখীন করে। তবে এমন ঘতনা সমাজে অহরহ ঘতে না। সে পরিচয় পূর্বেই পাওয়া গেছে। গর্ভবতী নিঃসহায় শোভা তেলে। মানসিক স্থৈর্য হারিয়েছে বুলবুল। কত মেয়েই এমন সামাজিক সম্পর্কের শিকার হয়েছে নিজের অজন্তে। রক্তের সম্পর্কের অপমান, নরনারীর সম্পর্ক মূল্য হীন হতে দেখে সমাজের সামগ্রিক চেহারাতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রেম যায় শরীরের পথে হারিয়ে। মানবীয় বিশ্বাসের চেয়ে জন্তব চাহিদাই বাস্তব সত্য হয়ে ওঠে। তারই পরিণামে প্রকৃত প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধ হয় না। সরল নিরীহ মেয়ে গুলির জন্যই তেলের চার দেওয়ালের অনির্দিষ্ট অন্ধকারময় জীবন অপেক্ষা করে। ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস শব্দ গুলি তার গভীরতা হারিয়ে বিদ্রূপ হয়ে প্রাণে বাজতে থাকে। কিন্তু কখনো কখনো এই হতাশাকে সরিয়ে দিয়ে রচিত হয় আর এক ইতিহাস ভালোবাসার ইতিহাস।

অবস্থাপন্ন বাঙালী ঘরের মেয়ে বাড়ীর অমতে পাশের বাড়ীর ড্রাইভারকে বিয়ে করে। রুষ্ট পিতার সঙ্গত নালিশে নেপালি বর বাঙালী বধূ লকাপে। বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত একজনকে লকাপে থাকতেই হবে। এত দিনের সব হিসেব ভুল প্রমাণিত করে পুত্রবধূকে জমিনে মুক্ত করে বাড়ী নিয়ে যান বৃদ্ধ নেপালি শ্বশুর। তাঁর পুত্র তো 'ডেরাইভার জত আছে'। পুরুষ মানুষ রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে, মজবুত শরীর তার, তেল খেতে নিতে পারবে। নির্দোষ অসহায় মেয়ে মানুষকে তেলের কষ্টে রাখার কোনো যুক্তি সঙ্গত কারণ খুঁতে পান নি বৃদ্ধ। তাঁর এই অভূতপূর্ব সিদ্ধান্তে কোর্তের সম্মতি তো মিলেইছে, এমনকি মেয়ের বাবা 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' হয়ে 'objection' দিতেই ভুলে গেছেন।

প্রচলিত রীতির বাইরে অন্য রকম ঘতনাতি ঘতার কারণ যে পাত্র আর তার পরিবার, সে কথা বলাই বাহুল্য। নেপালি সমাজেএক শ্রেণীর বিবাহের ব্যাপারে একতা রীতি প্রচলিত—পছজৈসই বিবাহযোগ্যা মেয়েকে তার বাড়ীর লোকজনের অজন্তে তুলে এনে পাত্রপক্ষ নিজের বাড়ীতে তিনদিন গোপনে রাখে। তারপরে কন্যার বাড়ীতে খবর পাঠানো হলে নিয়ম রীতি অনুসারে শুভ কাত সম্পন্ন হয়। উক্ত নেপালি

পরিবার বধূকে ত্যাগ করার কথা হয় তো তাদের প্রচলিত রীতি অনুসারেই ভাবতে পারে নি। অবশ্য কিছুদিন বিবাহিত জীবন অতিবাহিত হবার পরে কি হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। অনেকতা সেই সাঁইথিয়ার লোকের বাড়ীর কাতকরে খাওয়া মেয়েদের বিবাহিত জীবনের পরিণতির মত। তবু অন্য রকম সম্ভাবনার আশা করতে ক্ষতি কি? বুলবল শোভা শিবানীদি প্রভৃতিদের অসহায় অবস্থার মিছিল দেখার পর এই নেপালি পরিবারতির সিঙান্ত মনতে তৃপ্ত করে বই কি!

লোভ, ঈর্ষা, অর্থের প্রলোভন, পরশ্রীকতরতা প্রভৃতি যে প্রবৃত্তি গুলি জীবনে অপরাধকে ডেকে আনে তা ধনী দরিদ্রের সীমারেখা হিসাব করে না। তাই কোনো ধনী পরিবার আরো ধনের আশায় আগুন দেয় বাড়ীর বউয়ের গায়ে। বিষের জ্বালায় মরে অভিত্রত গৃহবধূ। বধূর বংশ কৌলীন্য যথেষ্ট নয় বলে অবোধ শিশুরা ততুগৃহে দাহ হয় নীল রক্ত অভিত্রত পরিবারে। পারিবারিক ব্যবসা ও সম্পত্তিগত কোঔলের পরিণতিতে খুন হয় কোনো এক শরিক পুত্র বা কন্যা। কিন্তু এই হত্যাকারীদের কাউকে ভানুমতী মহাদেবিয়ার মত তেল খাততে বা শনিচরির মত অতল আঁধারে তলিয়ে যেতে কোনো দিন দেখা যায় না। এদের রক্ষা কবচ অর্থ এবং প্রতিপত্তি। অবশ্য এই হারিয়ে যাওয়াতা কাম্যও নয়। কিন্তু কাম্য না হওয়াতা ধনী দরিদ্র কারে ক্ষেত্রেই নয়। ছেঁড়া কাঁথা কানি পরা নিম্ন পেশার নিরক্ষর আইন কানুন না তনা, পুলিশের নামে আতঙ্কিত হয়ে, তেলে আশার আগে তেল শব্দের অর্থ না তনা, কোনো ছোতখাতো চুরি বা দাঙ্গাহাঙ্গামা বা হঠাৎ কোনো খুন তখমে তড়িয়ে পড়া মানুষ গুলির ক্ষেত্রেও নয়। সবার ক্ষেত্রেই বিচার পঙতি এক হওয়া উচিত।

কোনো শহরে বা শহরতলীতে ঠান্ডা মাথায় যারা মানুষ খুন করে, পরে ভুল লোককে হত্যা করেছে বলে নিশ্চিন্তে ঠিক লোকের সন্ধানে চলে যায় তারা কিন্তু সমাত নির্দেশিত অপরাধীদের জীবনে সামিল হয়ে পাগলবাড়ীর অন্ধকারে হারিয়ে যায় না। চোদ্দ বছরের তো প্রশ্নই ওঠে না, চোদ্দ দিনও তেল খাতে না তারা। প্রমানাভাবে তমিনে মুক্ত হয়ে যায়। আর অর্থাভাবে তমিন পায় না ভানুমতীরা। তাই প্রমানাভাবে কোর্তের দিনের প্রতীক্ষায় কেতে যায় তাদের বছরের পর বছর। এই ভাবে গড়িয়ে চলে নূরতহানের জীবন। কেউ তনেনা কবে কোন অপরাধে সে তেলে বণ্ডী। হঠাৎ একদিন রায় বেরোয় তার ছয় মাসের তেল। তখন তার কেতে গেছে ছয় বছরেরও অনেক বেশী। এখানেই তার একমাত্র সন্তানের মৃত্যু। বাইরের তাৎ তার অপরিচিত। স্বামী তার খোঁত করে নি কখনো। গৃহহারা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অধিকারী নূরতহান নিতেকে রাখবে কোথায় এ বিশ্ব সংসারে? তার চেয়ে তেলে সবার তন্য নক্সার তিনিস বুনে হাতের নখ চোখের দৃষ্টি হারিয়ে কোনো মতে জীবনতা বহন করে যেতে পারলেই যথেষ্ট। এই যে একতা জীবনের অপমান ও অপচয় তা কত জীবনের পরিণামকে যে ঈঙ্গিত করে তা সহতেই অনুমেয়। দিনের পর দিন বিচারের বাণী নিরবে নিভৃতে কেঁদে চোখের তল মনের ব্যথা থামিয়ে দিতে বাধ্য হয়। আছে এর প্রতিকার? মনে হয় কোনো অধিকর্তারই এর উপায় তনা নেই। তনার ইচ্ছাও নেই।

পূর্বপাকিস্তানের আণ্ডোলন ও লড়াইয়ের সময় তাড়া খেয়ে একতি পাকিস্তানী দল ভারতে ঢুকে পড়ে। এরা নিরপরাধ বণ্ডী। সামরিক অফিসারদের স্ত্রী কন্যাও আছে এদের দলে। পর্দানশীন রক্ষণশীল মুসলমান মহিলাদের বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় প্রায় নেই বললেই চলে। অল্পবিস্তর লেখাপড়া তনা থাকলেও রাতনীতি সমাতনীতি নিয়ে সচেতনতা তাদের জীবনে প্রবেশ করেনি। পশ্চিমা মানুষদের জীবনের একতা ছোট্ট চিত্র এদের মাধ্যমে মেলে।

যে পশ্চিমা মিলিতারীরা রক্ত আর অত্যাচারের বন্যায় ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিল বাংলাদেশকে তাদেরই একতনের কন্যা মুন্নি। একতন স্নেহপরায়ণ সহৃদয় মানুষের ছবি, পিতৃস্মৃতি বলতে তার হৃদয়ে বিরাতমান। নিরস্ত্র নির্দোষ মানুষকে, ন্যায়ের তন্য যুঙ রত মানুষকে, কসাইয়ের নির্দয়তায় খুন করে সেনা বাহিনীর যে লোকেরা-তাদের এমন স্নিজ প্রেমময় পারিবারিক জীবনের চিত্র মনকে চমৎকৃত করে। বিশ্বসংসারে পিতৃ হৃদয়ের স্নেহের ধারা, তার স্নিজ তা নির্ভরতা নিয়ে সন্তান হৃদয়ে বর্ষিত। তাই পশ্চিমা মিলিতারী অফিসার, রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা ও মিনির পিতা সবার পিতৃহৃদয় এক চিরপরিচিত চিরন্তন সূত্রে গ্রথিত হয়ে পড়ে।

শিক্ষার অপ্রসারতা কুসংস্কারকে জীবনের অঙ্গ করে দেয়। তাই তেলের অস্বাভাবিক নানা কষ্ট সব মিলিয়ে মনের বণ্ডী দশা থেকে বেরিয়ে আসার তাগিদে বণ্ডীদের কেউ কেউ মানসিক ভারসাম্য হারায়। তাদের এই অস্বাভাবিক আচরণ হিস্তিরিয়ারই বহিঃপ্রকাশ বলা যেতে পারে। গ্রাম্য অশিক্ষিত বণ্ডিনীদের কাছে এ হল 'তিন'-এ পাওয়া। দূর পাকিস্তানের না-তনা তয়গার নতুন মানুষ রসিদাফুফু। তেলে কারোর সঙ্গে তেমন আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। কিন্তু 'তিন'-এ পাওয়া অবস্থায় অসহ্য ছতফতানীর মধ্যে তেলে সবার তন্য শুভেচ্ছা বাণী বর্ষিত হয়েছে তাঁর হৃদয় থেকে একতন মঙ্গলাকাঙ্খী মায়েরই মত। যে মায়ের মন তত ধর্ম রক্ত মেনে তার শুভেচ্ছা বর্ষায় না। শিক্ষা দীক্ষা কূল মানের পরিচয় তার তন্য অবশ্যম্ভাবী হয় না। বিশেষ করে নকশাল বণ্ডীদের তন্য আকাশে বাতাসে যখন দেশী প্রশাসন সহায়কদের মুখে এই ভাষা ঘুরে বেড়াত—*"এতাকে এখনো বাঁচিয়ে রেখেছ কেন? গুলি করে মেরে দাও নি কেন এ্যাঁ?"* কিম্বা কেউতের বাচ্চা আর তার বিষের সঙ্গে তুলনা হত তাদের। মনে করত *"ডেঞ্জারাস স্যার। হিংস্র তাইপ।—এদের শায়েস্তা করা দরকার।"* তখন একতন অল্প পরিচিতা বিদেশীনির হৃদয়ের শুভকামনা আর আশ্বাস ভরা বাণীতে চোখের পাতা ভারি হয়ে আসে। এদের প্রতিও তেল কর্তৃপক্ষের ব্যবহার কখনো সম্মান তনক হয় নি।

তেলের চিত্র এই খবরই দেয় যে—এখানকার মানুষতন যত কষ্টেই থাকুক অন্যের দুঃখ সামান্যতম লাঘব করতে পারলে আন্তরকি আনণ্ডে ভরে ওঠে তাদের মন। রমতনের মাসে উপোসী মুসলমান রমণীদের তন্য আসা বিশেষ খাবার নানী, হমিদার মা, আসমার মা-রা ভোর রাতে রেখে দিত নিতেরা অল্প খেয়ে কখনো বা না খেয়ে। কারণ পরিষ্কার কাবুলিছোলার ঘুগনি, চপ, মিষ্টি অন্য সময় তো মেলে না। আর

যার উপোসী নয় তারা পায়ও না। কন্যাসমা হিণ্ডু মেয়েদের বঞ্চিত করে মুসলমান তনীপ্রতিমদের মুখে এই সুখাদ্যগুলি ওঠে না। উৎসবের দিনে প্রাচুর্যের মধ্যে কাউকে আপ্যায়ণ করা সহত। কিন্তু এই বণ্ডীশালায় মাপা খাবার থেকে কিছুতা তুলে রাখা, তাও উপোসী অবস্থায় এবং অন্য ধর্মের মেয়েদের তন্য—হৃদয়ের ঐশ্বর্যের এমন প্রকাশ মনকে অনাবিল আনণ্ডে ভরিয়ে তোলে। এমন কত শিবরাত্রি, বড়দিন, রমত্তনের উপোস সমাত্তের সমস্ত বিভেদ বিচ্ছেদ ঘুঁচিয়ে দিয়ে অন্তরের পত্রিতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আধ চামচ সিমুই কিম্বা পাঁচতি বোঁদের দানা হিণ্ডু ও মুসলমানের সংকীর্ণ গন্ডী অতিক্রম করে নিরানণ্ডময় তেলকে ঈদের চাঁদের মতই নির্মল আলোয় প্লাবিত করে তোলে।

কিন্তু নারীত্তীবনকে অন্ধকার নানা দিন দিয়ে ঘিরে রাখে। অনিচ্ছুক কিশোরীকে দেহ ব্যবসায় নামাতে অক্ষম সরযূ আক্রোশে তাকে খুনই করে বসে। নিষ্ঠুরতা নিয়ে কুড়ি বছরের তন্য তেলে এসে সে নিমর্মতার প্রতীক হয়ে ওঠে। কিন্তু সব বাইত্তীরা দেহ পসারিণী হয় না, খাঁতি লক্ষ্ণৌ ঘরানার বংশধরদের অর্থোপার্ত্তনের উৎস নাচ গান। সুস্থ স্বাভাবিক ত্তীবন এরা পায় না। ঘরে অশান্তি করে তাদের কোনো বাঁধা 'বাবু' তাদের গৃহে এসে শান্তিতে আত্মহত্যা করলে শাস্তি পায় বাইত্তীরাই। কেউ প্রকৃত সত্য ত্তনতেও চায় না আর এরাও নিত্তেকে নির্দোষ প্রমাণ করার সুযোগ পায় না।

লঘু পাপে গুরু দণ্ডও ভুগতে হয় বণ্ডিনীদের। ত্রাসন্ধের সময় থেকেই এই অবস্থার কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ে না। কাত করে দিনের পর দিন বাড়ী যাবার অনুমতি, বেতন না পেয়ে কর্তৃর দুতি শাড়ী চুরির অপরাধে বণ্ডিনী কিশোরী পুতুল। কিম্বা কামার্ত মনিবের ইচ্ছা প্রতিহত করায় মিথ্যা চুরির দায়ে তেল খাতছে শহুরে রীনা। এরা প্রতিবাদ করতে চায় কিন্তু ত্তনে পরিণামহীন পরিণতি। ফলে নিরুপায় হয়ে নীরবতাই শ্রেয় হয়ে ওঠে। কিন্তু এদের মধ্যেই উল্কার মত আবির্ভাব এক প্রতিবাদী সুণ্ডরী পরিচারিকার। মিথ্যা ঘড়ি ও ব্যাগ চুরির অভিযোগে তেল বাস হয় তার। ছাড়া পেয়েই উক্ত চুরির অভিযোগকে সত্যি প্রমাণ করতে পাশের বাড়ীর গাছ বেয়ে তার মনিব বাড়ীতে প্রবেশ। তার আত্মসম্মান বোধই তাকে প্রতিবাদের এই পঙতি তুগিয়েছে। যদিও ধরা পড়ে এবার সে অনির্দিষ্ট কালের তন্যই তেলে। তার প্রতিবাদের প্রচেষ্টা আবার অবিচার আর ব্যর্থতার স্রোতে হারিয়ে যায়।

এ রকম সাধারণ পরিচারিকা আর রাঁধুনিরাই চুরির অভিযোগ (যা তারা হয় তো করেই নি) তেল ভরিয়ে রেখেছে। আর যারা ছোতো খাতো চুরি সত্যিই করেছে তারা এতাকে তাদের অধিকার বলেই মনে করে। কারণ বাঁচার তাগিদে তাদের এ কাত করা। এই অপরাধীদের আয়ত্তে রাখার তন্যই এত আইন কানুন প্রশাসন ব্যবস্থা! এত সাবধানতা! বাঘা পুলিশ অফিসারদের কর্ম ব্যস্ততা?

লাল মখমলের গাউন পরা অপরাধিনীরা যতই পুত্রবধূকে হত্যা করুক বা নৃশংশভাবে ভাইঝিকে শেষ করে দিক—চোখের পলকে তাদের তমিন মেলে সে কথা আগেই বলা হয়েছে। তারা নিরপরাধও সাব্যস্ত হয়। কিন্তু এর চেয়ে অনেক কম কিম্বা বিনা অপরাধে যাবজ্জবীন অথবা সশ্রম কারাদন্ড ভোগ করে শনিচরিরা। সন্তান হারায় শ্যামা তেলে এসে। তার সাত্ত চোদ্দ বছরের। 'সদাচারী' হলে আত বা দশ বছরেই মেয়াদ শেষ হয়। এই তেল বাসের ফলে তাদের সংসার তছনছ হয়ে যায়। স্বামী গ্রহণ করে না। বিশাল ত্তাতে নিত্তের ঠাঁই খুঁত্তে দিশাহরা হয় তারা। ফলে অনিবার্য ভাবে কারার লৌহকপাতই তাদের স্থায়ী ঠিকানা হয়ে ওঠে। প্রশাসনের 'অপরাধী' তৈরীর 'কল' ভাঙতে উদ্যত হয় না কোনো বিচলিত মন।

তেলের 'সদাচারের' অর্থতি স্পষ্ট হলে কারা ত্তীবনের আর একতি দিক উন্মোচিত হবে। এখানে শব্দতির অর্থ হল কারার সব নিয়ম মেনে পরস্পরকে এবং কর্তপক্ষকে সুবিধা অসুবিধায় সাহায্য করা। তাতে মার্কা পাওয়া যায়। বেশী মেয়াদের কয়েদিরা মার্কা পেলে তাদের শাস্তির মেয়াদ কমে যায়।

কিন্তু এ হল প্রথা। মার্কা পাবার ব্যবহারিক পথ হল কর্তৃপক্ষের মনোরঞ্জন করে চলা। অবশ্য এই প্রথাতি সমাত্তের অন্য ক্ষেত্রেও উন্নতির সোপান রূপে সহত্তেই গৃহীত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত। (যদিও আলোচনার সময় নিণ্ডিত)। মনোরঞ্জনের ব্যবহারিক অর্থ আনুগত্য। তেলের শাসন ব্যবস্থায় মেত্রন থাকেন। তাঁর নিচে দুতন ত্তাদারনীর দায়িত্ব পালা করে তেলের নিয়ম সামলানো, তার পরের পদ'মিতিনে'র। আত দশ বছর তেল খাতার পর কয়েদীদের আনুগত্য বুঝে এই পদে বহাল হয়। এখানকার আনুগত্যের অর্থ দুর্বল বণ্ডীদের সবল বণ্ডী কর্তৃক অমানুসিক নির্যাতন। এই অত্যাচার করতে কেউ অস্বীকার করলে তা অবাধ্যতার চূড়ান্ত নিদর্শন রূপে পরিগণিত হয়। তাই দীর্ঘ মেয়াদী বণ্ডিনী বা সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিতরা ক্রমশঃ নিষ্ঠুর থেকে নিষ্ঠুরতর হয়ে থাকে। তেলের এই নতুন অভিধান অনুসরণ করেই সরযূ মেত্রন বা ওয়ার্ডারদের মাতৃবৎ দেখে আর সাধারণ বণ্ডিনীদের আতঙ্ক স্বরূপ হয়ে ওঠে। এই মার্কার লোভই মহাদেবিয়াদের ক্রমশঃ নির্মমতার প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত করেছে। এক সময় অসুস্থ বণ্ডিনীদের তন্য তেলের হাসপাতালে ন্যায্য ওষুধের তন্য যারা বাকবিতন্ডা করেছে অদৃষ্টের পরিহাসে কিছুকাল পরে তাদেরই অত্যাচারে বণ্ডিনীরা হাসপাতালে ভর্তি হয় শুশ্রূষার তন্য। বিচারাধীন বণ্ডিনী শিখার নিষ্ঠুরতা থেকে শিশুর শরীরও রেহাই পায় না। কোর্তে অপরাধ প্রমাণ হবার আগেই সে বিভৎস অপরাধীতে পরিণত। হাত্তত নম্বরে সন্ধ্যা থেকে সারা রাত ম্লান আলোর তলায় যে অত্যাচার বণ্ডিনীর ওপর বণ্ডিনীরা করে তা কোনো অর্থেই অপরাধী সংশোধনের সংজ্ঞা বহন করে না। নিরপরাধ বণ্ডিনীরা প্রতিপত্তি পেয়ে তিলে তিলে দাগী অপরাধীতে পরিণত হয়। শারীরিক অন্য অত্যাচারের সঙ্গে চলে যৌন অত্যাচারও। এ সবই রাতভর মৃদু আলোয় শিশু, কিশোরী ও বৃণাদের সামনে ঘতে চলে। যে তপন আধো উচ্চারণের গন্ডী পেরোয় নি, আদুরে পুন্নি তার শৈশব অতিক্রম করে নি এবং নানা স্তরের বণ্ডিনীরা এ সব দেখে আতঙ্কিত হয়। ধীরে ধীরে তাদের সুকুমার বৃত্তি, শুভবোধ, ত্তীবনের প্রতি ইতিবাচক ভাবনা সব পরিবর্তিত ও সংশোধিত

হতে থাকে। তর্তন গর্তন স্বেচ্ছাচার, নৃশংসতার দীক্ষা শুরু হয়ে যায় নিত্তের অত্তন্তেই। কর্তৃপক্ষের ইচ্ছার পরিধির বাইরে গেলে অবশ্য এরা অতলে হরিয়েও যায়। বাধ্য বণ্ডিনী অর্থাৎ সদাচারীদের মধ্যে থেকে নতুন 'মেত' বহাল করা হয়। তেলের চার দেওয়ালের একঘেয়ে পশুর বণ্ডী ত্তীবন যাদের মনকে পীড়িত করে না, বরং অন্য বণ্ডিনীদের বঞ্চিত করে ক্ষমতা উপভোগ এবং রুত্তি রোত্তার বাড়ানোতা যাদের কাছে ত্তীবনের এক মাত্র লক্ষ্য তারা এ ত্তীবন ত্যাগের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। কিন্তু এদের স্বভাবে কিছুই কি ভালো ছিলো না? এরা কি চায় নি আর পাঁচতা স্বাভাবিক ত্তীবনের মাঝে মিলে যেতে! এদের ত্তীবনবৃত্তান্ত তো সে চিত্রই মেলে ধরে। অন্তরে শুভ ও সৎ ভাবনা বিকশিত করার বদলে সমস্ত কু প্রবৃত্তি গুলিকে বাধাহীন ভাবে স্বেচ্ছাচারীর মত ব্যবহার করার সুযোগ তো তেলখানাই করে দিয়েছে। এরা তো কেউই প্রকৃত অপরাধী নয়! যথার্থ অপরাধ ত্তাতের লেকেরা বহু রকম অপরাধ পরিচালনা করে। হরিয়ে যাওয়া ছেলেদের ধরে বিকলাঙ্গ করে দিয়ে ভিক্ষা বৃত্তিতে নিযুক্ত করে। এতে রোত্তার ভাল। ছেলেরা পালাতেও পারে না। রীতিমত ভিক্ষা দিয়ে পকেতমার ভিখারী চোর প্রস্তুত করা হয়। সমাত্তের প্রভাবশালীদের সমর্থনেই এই কর্মকান্ড সাধিত হয়। তাই ধরা পড়লেও এর শীঘ্রই মুক্ত হয়ে যায়।

পতিতাপল্লীর পরিচালনার ভারও অপরাধ ত্তাতের লোকেদের হাতে। নানা কৌশলে তেল থেকে তের করে পছওসই নারী ধরে নিয়ে গিয়ে ব্যবসা নিশ্চিন্ত করে তারা। এই অসহ্য ত্তীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে মেয়েরা নেশার দ্রব্যের অধীন হয়ে পড়ে। তা-ও হাতে আসার সুযোগ তেলই করে দেয়। অন্ধকারে তলিয়ে যাবার সুবওৌবস্তে কোনো ফাঁকি থাকে না।

দারিদ্র্য নারীকে স্বেচ্ছায় কোন অতলে উপস্থিত করে তারও খবর মিলবে এখানে। দীক্ষা প্রাপ্ত পকেতমারে রূপান্তরিত এক নারী যার স্বামী সংসার সব থেকেও নেই। অপরাধ ত্তাতের স্থায়ী বাসিওা সে। এই পেশাতেই সে স্বামীর পাকা ব্যবসার ব্যবস্থা, স্বামী-সন্তানের নিশ্চিন্ত ত্তীবন দিয়েছে। কিন্তু অন্যের সর্বনাশ করে ত্তীবনের নিশ্চিন্ততা তৈরীর মানসিকতা তো প্রথম থেকেই তার ছিল না? এমন ত্তীবনে সে পরম আনওে এসে পড়ে নি। দরিদ্র-কন্যা আর দরিদ্রের স্ত্রী ছিল সে। অভাব আর অপমানের যন্ত্রণা ভুলে থাকতে স্বামী মাতাল হয়ে স্ত্রীকে মারে। আর সংসারের দিকে চেয়ে সব যন্ত্রণা সহ্য করে কাতে বেরতে হয় তাকে। এমতাবস্থায় স্বামীর এক মাতাল বন্ধুর পরামর্শে অর্থাভাবের ত্বলা ঘোঁচাতে এই পঙ্কিল পথে প্রবেশ তার। কিন্তু স্বামী-সন্তানের মাথা থেকে নিত্তের অশুভ ছায়া সে দূরে সরিয়ে রাখতে চায় যে কোনো মঙ্গলাকাঙ্খি স্ত্রী ও কল্যাণী মায়েরই মত। এই অপরাধিনীর উচিত অনুচিত ভালো মওের বিচার হবে কোন নিক্তিতে? কার তত্ত্বাবধানে? আছে কোনো উপযুক্ত মাধ্যম?

তেনানা ফাতকের সময় মুসলমান রমণীদের অসহায়তা যে স্তরে ছিল আত তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তিন তালাকে বিচ্ছেদের পথে বাধা আছে। শ্বশুরের ধর্ষণে, পুত্রবধূকে স্বামী ত্যাগ করে শ্বশুরের সঙ্গে বাধ্য হয়ে থাকতে হয় না। মাতৃহন্তা পিতাকে তেল থেকে মুক্তি না দিতে ভীতা কন্যার আর্তিকে গুরুত্ব দিয়ে মেনে নেওয়া হয়। আতকের নারী তার অধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা চাহিদা সম্পর্কে সচেতন। অন্যায়ের বিরুত্তে প্রতিবাদেও স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু, তবু এদের ত্তীবনে একতা কিন্তু থেকেই যায়। রোতদিনের সংবাদ যখন এই তথ্য গুলি পরিবেশন করে—তরুণ বা কিশোর কর্তৃক নাবালিকা ধর্ষিতা। বৃত্ত শ্বশুরের কামনার শিকার তরুণী পুত্রবধূ, ধর্মযাত্তিকাদের প্রতি উচ্ছৃঙ্খল তরুণদের অশালীন আচরণ, সমাত্তের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের গোপনে একাধিক বিবাহ, সহপাঠীদের তৈবিক প্রবৃত্তির স্বীকার সহপাঠিনী প্রভৃতি, তখন সমাতেছড়িয়ে থাকা অসুস্থ মানসিকতার পরিচয়ে সমাত্তের স্বরূপতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আত্মসম্মান বোধ, মূল্যবোধের অভাব মানুষের ত্তীবনকে অসহিষ্ণুততা ও বিশ্বাসহীনতার ঘন কালো ছায়ায় ঢেকে ফেলেছে বোঝা যায়। শিথিল হয়েছে আত্মিক সম্পর্কের নিবিড় বন্ধন। সর্ব স্তরের নরনারীর ত্তীবনের নিত্য সঙ্গী নিশ্চিন্ততার অভাব। তাই অবৈধ সম্পর্কের বিভৎস চেহারা দেখায় সমাত। কন্যাদের সম্মুখে তাদের মাকে হত্যা করতে পারেন পিতা নির্দ্বিধায়। স্বামীর অবৈধ সম্পর্কের প্রতিবাদের পরিণাম এই হত্যা। বিকৃত মানসিকতার মানুসগুলির আত্মরক্ষার এতি পুরাতন অস্ত্র। তবে মীনাক্ষী সেনের সময় থেকে এর ব্যাপকতা এবং বিভৎসতা চোখে পড়ার মত। এখন নারীর ক্ষমতার বিস্তার ঘতেছে—'সরকারী হাসপাতালে দালালি ব্যবসায় এখন মহিলারাই ডন'—সংকলনতি এইতাই প্রমাণ করে। এই 'মহিলা ডন'দের ক্ষমতার মদে মত্ত নিষ্ঠুর হৃদয় গুলির আড়ালে সরল নিষ্পাপ দরিদ্র রমণীর কল্যাণী মূর্তির ব্যর্থ রূপ উঁকি মারে না কি? নিত্তের সংসারকে সব অশুভ শক্তি থেকে মুক্ত রাখার আকুতি ছিল যাদের দুই চোখ তুড়ে? সুস্থ স্বাভাবিক চাহিদায় এমন ত্তীবনের স্বপ্ন কখনো তারা দেখে নি। বাঁচার তাগিদে বাধ্য হয়ে সমাত প্রদর্শিত এই পথ যে তারা বেছেছে সে কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

শুধু ত্রাসন্ধের কেন রবীন্দ্রনাথেরও সময় থেকে আত পর্যন্ত সমাত্তের ব্যবস্থা, আইনকানুনু, তেল প্রশাসন ও বিচারের বিধি সাধারণ মানুষের ত্তীবনকে কখনো সম্পূর্ণ সুস্থ করতে পারেনি। আপাত উন্নতি আর স্বাধীনতার আড়ালে নারীর বঞ্চনাময় ত্তীবনের যন্ত্রণা ভিন্ন ভিন্ন চেহারায় বহাল থেকেছে। ত্তীবন ও সমাত্তের পুরো ব্যবস্থাতাই যদি নতুন করে ঢেলে সাতনো যেত!

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। শিলং তেলের ডায়রী—সুরমা ঘতক, অনুষ্টুপ প্রকাশনী।

২। তেনানা ফাতক—রাণী চওঁ, আনওঁ পাবলিসার্স লিমিতেড।

৩। হাততি নম্বর মেয়াদী নম্বর—মীণাক্ষী সেন, কারিগর।